সঙ্গীত দর্শিকা

ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সঙ্গীত-দর্শিকা

প্রথম খণ্ড

৺ ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
প্রাক্তন প্রধান অধ্যাপক, উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বিভাগ
বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

ও

শ্রীননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত বিশারদ (লক্ষ্ণৌ)
অধ্যক্ষ—গভর্ণমেণ্ট স্পনসর্ড টিচার্স ট্রেনিং ইন্‌স্টিটিউট
(মিউজিক) ; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং লক্ষ্ণৌ
ভাতখণ্ডে সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ অনুমোদিত
বেঙ্গল মিউজিক কলেজ ও আর্য্য
সঙ্গীত বিদ্যাপীঠ, কলিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
১লা বৈশাখ, ১৩৫৮
দ্বিতীয় সংস্করণ
মহালয়া, ১৩৬৫

প্রকাশক
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়
রামকৃষ্ণ আশ্রম, যাদবপুর।
প্রাপ্তিস্থান
বেঙ্গল মিউজিক কলেজ
৪নং হিন্দুস্থান রোড, কলিকাতা-২৯

পাঁচ টাকা

মুদ্রাকর
বরেন্দ্রকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়
দেশবাণী মুদ্রণিকা
১৪-সি, ডি. এল্. রায় ষ্ট্রীট্, কলিঃ-৬
বাঁধাই—ওরিয়েণ্ট বাইণ্ডিং ওয়ার্কস্
প্রচ্ছদ শিল্পী—হরিপদ দাস
ব্লক—নিওপ্রসেস্

উৎসর্গ

যাঁহাদের সান্নিধ্য ও প্রেরণা আমার সঙ্গীত জীবনের প্রথম অরুণোদয়কে রূপে, রসে ও ধ্বনির বিচিত্র মূর্চ্ছনায় রমণীয় করিয়াছে—যাঁহাদের আন্তরিক আশীর্ব্বাদ নিরন্তর আমাকে সঙ্গীতের নব নব রূপ উপলব্ধির চরিতার্থতা আনিয়া দিয়াছে, স্বর্গীয় পরমারাধ্য সেই পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর শ্রীচরণ কমলে 'সঙ্গীত-দর্শিকা' ভক্তি-অর্ঘ্য স্বরূপ উৎসর্গ করিয়া ধন্য হইলাম।

ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

ভূমিকা

স্বনামধন্য পণ্ডিত স্বর্গীয় বিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে আধুনিক উত্তর-ভারতে প্রচলিত উৎকৃষ্ট ধ্রুবপদ-খেয়াল গানের 'নির্যাস উদ্ধার করে' ক্লাসিক্যাল রাগ-সঙ্গীতের অভিনব ভিত্তি প্রস্তুত করে' গিয়েছেন। তাঁর প্রদর্শিত ব্যবহারিক পদ্ধতি ও রাগ-শ্রেণীকরণের তত্ত্ব আজ সঙ্গীতসেবী সর্বসাধারণের অধিকারে এসেছে।

শ্রীভাতখণ্ডের পদাঙ্ক অনুসরণ করে এ পর্যন্ত কালে বহু কৃতবিদ্য ব্যক্তি সঙ্গীত বিষয়ে পুস্তক প্রণয়ণ করেছেন। যে কারণেই হ'ক, এঁদের মধ্যে অনেকেই সঙ্গীত-রাজ্যের পূর্বতন অপরাপর ধারা যথা কীর্তন, বাউল প্রভৃতি গান সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনা, এমন কি উল্লেখও করেন নি। এঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় নিয়ে মনে হয়,—এঁদের মতে অপরাপর গীতধারা যতই মধুর ও রঞ্জনাদায়ক বস্তু হ'ক, এ সবের মধ্যে যেন 'রাগ' বস্তুর অভাব এবং সেই কারণে এগুলি রাগ-সঙ্গীতের পর্যায়ে আসে না, সুতরাং তাঁদের মত পণ্ডিতবর্গের আলোচনার যোগ্য নয়।

"সঙ্গীত-দর্শিকা" নামে এই পুস্তক পাঠ করে' দেখলাম গ্রন্থকারের সঙ্গীত-দৃষ্টি মাত্র ধ্রুবপদ-খেয়াল গানের মনোহারিতার মধ্যে নিবদ্ধ নয়। কীর্তন ও অপরাপর সঙ্গীতের গুণ, রূপ ও লক্ষণ আলোচনার যোগ্য মনে করা হয়েছে। শ্রীভাতখণ্ডেকে অনুসরণ করলেই যে সঙ্গীতের ব্যাপকতা ও সর্বজনপ্রিয়তাকে তুচ্ছ মনে করতে হবে, এ রকম আভাস এই পুস্তকের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয় নি।

এই পুস্তকের অন্য গুণ এই যে—বাহুল্য বর্জিত হয়েছে; যথা সম্ভব সংক্ষেপে সারবান অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ হয়েছে। বিশেষ এই যে নূতন

শিক্ষার্থীর আয়াস ও আগ্রহকে উজ্জীবিত করার উপযোগী সরল সহজ বোধ্য ভাষায় গ্রন্থকার রচনা-চেষ্টা করেছেন।

সুধী পাঠক ও শিক্ষার্থী এই গ্রন্থ পাঠ অভ্যাস করে' তৃপ্তি লাভ করবেন। এই গ্রন্থের সমাদর ও বহুল প্রচার হ'ক বলাই বাহুল্য।

২।৪।৫৮ ইতি—

শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল
কৃষ্ণনগর

গ্রন্থকারের নিবেদন

সংগীত দর্শিকার প্রথম সংস্করণ বহুদিন পূর্ব্বেই নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছিল। দ্বিতীয় সংস্করণ ছাপিবার প্রভূত ইচ্ছা ও প্রয়োজন থাকা সত্বেও অনিবার্য্য কারণে তাহাতে বিলম্ব ঘটিল এইজন্য আমি দুঃখিত। প্রথম সংস্করণ প্রকাশ কালে মদগ্রজ সঙ্গীতবিশারদ পূজ্যপাদ ৺ক্ষিতিশচন্দ্র বন্দোপাধ্যায় মহাশয় জীবিত ছিলেন; তাঁরই যত্নে ও উৎসাহে তাঁরই অনুজ সহকারী হিসাবে এই পুস্তিকা প্রকাশে সমর্থ হই। আজও স্নেহময় প্রাণ সেই অগ্রজ মহাশয়ের পূত আশীর্ব্বাদই আমার সকল কার্য্যে প্রেরণা জোগাইতেছে তাহা আমি মর্মে মর্মে অনুভব করি। মদীয় সঙ্গীত গুরু পরম শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুত শ্রীকৃষ্ণ নারায়ণ রতনজনকর মহোদয় সঙ্গীত দর্শিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে উপদেশ দেন। অধিকন্তু পরম শ্রদ্ধেয়া শ্রীযুক্তা মায়া বন্দোপাধ্যায় মহাশয়ার উৎসাহে ও পুনঃ পুনঃ তাগিদে এবং উক্ত অগ্রজ মহাশয়ের আশীর্ব্বাদে সঙ্গীত দর্শিকার দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশে ব্রতী হইয়াছি। সংগীত দর্শিকা প্রথম শিক্ষার্থীদিগের উপযোগী করিয়া রচিত হইয়াছিল এবং সেই উদ্দেশ্য বহুলাংশে সার্থক হইয়াছিল। তৎসত্বেও কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধণের তাগিদ অনুভব করায় পুস্তকের কলেবর কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি করিতে হইল। পণ্ডিত ভাতখণ্ডের গ্রন্থই যে এই পুস্তিকার মূল উৎস তাহা বলাই বাহুল্য। ভারতীয় সংগীতের বিভিন্ন ধারার আস্বাদ গ্রহণে সহায়তা করাই এই পুস্তকের মুখ্য উদ্দেশ্য এবং সংগীত বৈচিত্র্যকে সাধনা ও অনুভূতির ক্ষেত্রে প্রয়োগের পন্থা নির্দ্দেশ করাই সংগীত দর্শিকার প্রাণবস্তু।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই, মিউজ এবং লক্ষ্ণৌ ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বার্ষিক শ্রেণীর পাঠ্য পুস্তকরূপে নির্দ্ধারিত হওয়ায় সম্প্রতি সংগীত দর্শিকা প্রথম খণ্ড পরিবর্দ্ধিত আকারে মুদ্রিত হইল। এই পুস্তিকার দ্বিতীয় খণ্ড বর্ত্তমানে যন্ত্রস্থ। উহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি, মিউজ এবং লক্ষ্ণৌ সংগীত বিদ্যাপীঠের চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীর উপযোগী করিয়া লিখিত হইয়াছে। শ্রীবিক্রমাদিত্য সিংহ নিগম প্রণীত "সংগীত কৌমুদী" এবং রায় বাহাদুর শ্রীখগেন্দ্রনাথ মিত্র সম্পাদিত "কীর্ত্তন-গীতি প্রবেশিকা" গ্রন্থ হইতে যথেষ্ট সাহায্য লাভ করিয়াছি। তদ্‌জন্য উক্ত গ্রন্থকারদ্বয়কে সশ্রদ্ধ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বনামধন্য সংগীতবিদ্ শ্রদ্ধেয় ডাঃ অমিয়নাথ সান্যাল মহাশয় এই পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়া দিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন। পরম শ্রদ্ধেয় স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ, ডাঃ এম, এম্. ঘোষ, সংগীত শাস্ত্রী শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, বাংলার চিত্রজগতের প্রখ্যাত সঙ্গীত পরিচালক শ্রীযুত রাইচাঁদ বড়াল, সুবিখ্যাত বীন্‌কার কুমার বীরেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, স্বনামধন্য সরোদী শ্রীযুত রাধিকা মোহন মৈত্র, বাংলার বিখ্যাত সুরস্রষ্টা ও গীতবাদ্যবিশারদ শ্রীযুত জ্ঞান প্রকাশ ঘোষ,সঙ্গীতবিদ্ ডাঃ বিমল রায়, খ্যাতনামা কীর্ত্তন গায়ক শ্রীযুত হরিদাস কর, বন্ধুবর শ্রীযুত চিত্ত রায়, শ্রীযুত বিভূতি দত্ত ও শ্রীযুত মণীন্দ্র-চন্দ্র চক্রবর্ত্তী আমাকে নানা ভাবে এই গ্রন্থ প্রণয়ণে যথেষ্ট উৎসাহ ও মূল্যবান উপদেশ দিয়া চির ঋণী করিয়াছেন।

শ্রীমান অরবিন্দ বিশ্বাস এবং আমার ছাত্র ও ছাত্রীগণ মধ্যে যাহাদের সক্রিয় সাহায্য পাইয়াছি তাহাদিগকে জানাই আন্তরিক আশীর্ব্বাদ। বিশেষ করিয়া মদীয় ছাত্র, সঙ্গীত বিশারদ শ্রীমান হীরালাল সাহা বি. এ, এই পুস্তক প্রণয়ণে অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া আমাকে যে সাহায্য করিয়াছে তাহা আমার অন্তরে চিরদিন জাগরূক থাকিবে।

এই প্রসঙ্গে বাংলার প্রতিষ্ঠাবান জনপ্রিয় সঙ্গীত শিল্পী আমার অগ্রজপ্রতিম অধ্যাপক, পল্লীসঙ্গীতবিশারদ শ্রীযুত সুরেন্দ্রচন্দ্র চক্রবর্ত্তী বি, এল, মহাশয়ের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য মনে করি। এই সংস্করণ প্রকাশে প্রভূত পরিশ্রম সহকারে তিনি নানাভাবে যে সহায়তা করিয়াছেন তজ্জন্য আমি আজীবন তাঁহার নিকট ঋণী রহিলাম।

আমার প্রিয়বন্ধুবর শ্রীহরিপদ দাস এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট অঙ্কন করিয়া দেওয়ায় আমি তাহার নিকট কৃতজ্ঞ।

আন্তরিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও গ্রন্থে হয়ত অনেক ভুল ভ্রান্তি রহিয়া গিয়াছে। আশা করি অনিচ্ছাপ্রসূত এই ত্রুটির জন্য সঙ্গীতানুরাগী সহৃদয় পাঠক পাঠিকাদিগের ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টি হইতে বঞ্চিত হইব না।

মহালয়া, ২৫শে আশ্বিন, ১৩৬৫ সাল
রামকৃষ্ণ আশ্রম
যাদবপুর, কলিকাতা-৩২

বিনীত—
ননীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়

সুচীপত্র

সঙ্গীত-দর্শিকা

প্রথম অধ্যায়

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস

ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনভাগে বিভক্ত করা যায়। যথা :—(১) **হিন্দু যুগ**—বৈদিক কাল হইতে আরম্ভ করিয়া দশম শতাব্দী পর্য্যন্ত।

(২) **মুসলমান যুগ**—একাদশ শতাব্দী হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত।

(৩) **ইংরেজ যুগ**—উনবিংশ শতাব্দী হইতে ১৪ই আগষ্ট ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত।

হিন্দু যুগ

ভারতীয় সংগীতের স্বরলিপি পদ্ধতি প্রথমতঃ আরব দেশে পরে সেখান হইতে একাদশ শতাব্দীতে Guido D' Arezzo নামক জনৈক বিশিষ্ট সংগীতবিদ কর্ত্তৃক ইউরোপীয় সংগীতে প্রবর্ত্তিত হয়।

রামায়ণ তথা মহাভারতের কাল

রামায়ণ মহাভারতের বিভিন্ন অংশে কণ্ঠ সংগীত এবং বাদ্য যথা—স্বর, মূর্চ্ছনা, জাতি, বীণা, মৃদঙ্গ ইত্যাদির প্রসঙ্গ আছে। তাহা হইতে প্রমাণিত হয় যে তৎকালেও সংগীতের বহুল প্রচার ছিল। প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে লিখিত নারদীয় শিক্ষায়ও স্বর, মূর্চ্ছনা, জাতি এবং বীণার প্রসঙ্গ আছে।

ভরত নাট্য শাস্ত্র (২০০ খ্রীঃ)

দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভরতমুনি নাট্যশাস্ত্র প্রণয়ন করেন। উক্ত গ্রন্থে সংগীত, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, নৃত্য প্রভৃতির বিশদ বর্ণনা পাওয়া যায়। উহাতে প্রতিপন্ন হয় যে ভরতের যুগে সংগীত বিশেষ উন্নত অবস্থায় ছিল।

মহাকবি কালিদাস এবং অন্যান্য কবিদের সময় (৫০০ খ্রীঃ)

পঞ্চম শতাব্দীতে কালিদাস এবং অন্যান্য প্রসিদ্ধ কবিদের লিখিত নাটক ও কাব্য পাঠে ইহাই প্রতীত হয় যে, তৎকালে হিন্দু রাজাদের সভায় প্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞগণ অবস্থান করিতেন।

মুসলমান যুগ

মুসলমানগণ একাদশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে আসেন। ঐ সময় হইতে ভারতীয় সংগীতের পরিবর্ত্তন দেখা যায়। মুসলমানগণ যদিও সংগীত-শাস্ত্রের আলোচনায় বিশেষ মনোযোগ দেন নাই তথাপি তাঁহাদের সময় সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। মুসলমানগণ কয়েকটি নূতন রাগ ও কয়েকটি নূতন বাদ্য আবিষ্কার করেন। প্রায় অধিকাংশ বাদশাহই সংগীতকে যথেষ্ট মর্যাদা দান করিয়াছিলেন।

একাদশ, দ্বাদশ, ত্রয়োদশ শতাব্দী ঃ—

একাদশ শতাব্দীতে সংগীতের অবস্থা পূর্ব শতাব্দীর মতই ছিল। কিন্তু দ্বাদশ শতাব্দীতে তৎকালীন বিখ্যাত গায়ক জয়দেব বাংলা প্রদেশে বীরভূম জেলার কেন্দূবিল্ল গ্রামে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলা বর্ণনা করিয়া 'গীত গোবিন্দ' নামে একখানি গীতি-কাব্য রচনা করেন।

সঙ্গীত রত্নাকর

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দাক্ষিণাত্যের দেবগিরি রাজ্যের যাদব বংশের রাজার দরবারে সুপ্রসিদ্ধ সংগীতজ্ঞ পণ্ডিত শার্ঙ্গদেব "সংগীত রত্নাকর" নামক একখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। এই গ্রন্থে নাদ, শ্রুতি, স্বর, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, জাতি ইত্যাদির বিশেষ বর্ণনা পাওয়া যায়। এই গ্রন্থকে প্রাচীন সংগীতের বিশেষ প্রামাণিক পুস্তক বলিয়া মানা হয়।

আলাউদ্দিন খিলজীর সময়

চতুর্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দিন খিলজীর সময় সংগীতের বিশেষ উন্নতি হয়। আলাউদ্দিন বাদশাহের দরবারে আমীর খুসরু নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক এবং কবি রাজমন্ত্রী ছিলেন। সংগীত জগতে আমীর খুসরুর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। ইনি কয়েক প্রকার নূতন রাগ, নূতন গান, নূতন বাদ্য ও তালের সৃষ্টি করেন। আমীর খুসরু নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সৃষ্টি করিয়াছিলেন।

১। কয়েক প্রকার নূতন রাগ যথা—জিলফ্, সাজগিরী, সর্পর্দা, ইমন, রাত্রি কালের পূরিয়া, বরারী, তোড়ী, আসাবরী, পূর্ব্বী ইত্যাদি।

২। কয়েক প্রকার নূতন পদ্ধতির গান—কৌল, কল্বানা, তারানা, খেয়াল (কওয়ালী খেয়াল), নক্স্, নিগার, গজল, সোহলা, তিলল্লানা ইত্যাদি।

৩। কয়েক প্রকার নূতন তাল—খ্‌মসা, সওয়ারী, পহলওয়ান, জতফ্‌রদোস্ত, পস্তো, কওয়ালী, আড়াচৌতাল, ঝুমরা, জলদ ত্রিতাল ইত্যাদি।

আমীর খুসরুর সমসাময়িক কালে দাক্ষিণাত্যের বিজয় নগরের রাজা দেবরায়ের দরবারে গোপাল নায়ক নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। গোপাল নায়কও কয়েক প্রকার নূতন রাগ সৃষ্টি করেন যথা—বড়-হংসসারঙ্গ, পিলু, বিরম ইত্যাদি।

"কওয়ালী খেয়াল"—খেয়াল দুই প্রকার (১) কওয়ালী খেয়াল (দ্রুত অথবা ছোট খেয়াল) (২) কলাবন্তী খেয়াল (বড় অথবা বিলম্বিত খেয়াল)। আমীর-খুসরু কওয়ালী খেয়াল সৃষ্টি করেন।

রাগ তরঙ্গিনী

চতুর্দশ শতাব্দীতে বাঙালী সংগীতজ্ঞ লোচন হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে "রাগ তরঙ্গিণী" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। তিনি লক্ষ্মণসেনের সভায় ছিলেন। এই পুস্তকখানি হিন্দুস্থানী সংগীতের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। লোচনের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানে "কাফী" ঠাটের মত যথা—"সা রে গ্‌ ম প ধ নি্‌ র্সা"। লোচন বারটি ঠাট মানিয়া লইয়া যাবতীয় রাগকে উহার অন্তর্গত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

সুলতান হোসেন শর্কী

পঞ্চদশ শতাব্দীতে জৌনপুরে সুলতান হোসেন শর্কী নামে একজন সংগীত প্রেমিক বাদশাহ ছিলেন। আমীর খুসরুর পরে হোসেন শর্কীই 'কওয়ালী' গানের বিশেষ প্রচার করেন। তিনি 'কলাবন্তী' খেয়াল আবিষ্কার করেন। ইনিও কয়েকটি নূতন রাগ সৃষ্টি করেন যথা—জৌনপুরী, সিন্ধু ভৈরবী, জৌনপুরী তোড়ী, রামান্ তোড়ী, রসুলী তোড়ী, বার প্রকার 'শ্যাম' (গৌড়-শ্যাম, মল্লার-শ্যাম, বসন্ত-শ্যাম, পূরবী-শ্যাম' ইত্যাদি), সিন্ধুরা ইত্যাদি। এই সময়ে উত্তর ভারতে পুনরায় ভক্তি আন্দোলন সুরু হয় এবং জনসাধারণের মধ্যে উহা সংগীতের সাহায্যে প্রচারিত হয়। কাজেই এই সময়ে কীর্ত্তন, সংকীর্তন এবং নগর কীর্তনের যথেষ্ট উন্নতি হয়।

আকবর বাদশাহের সময়

ষোড়শ শতাব্দীতে আকবর বাদশাহের সময়ে সংগীতের যথেষ্ট উন্নতি হয়। সম্রাট স্বয়ং সংগীত প্রেমিক ছিলেন। তিনি সংগীতের উন্নতির জন্য যথেষ্ট যত্ন লইতেন। তৎকালীন শ্রেষ্ঠ গায়ক এবং বাদকদের যথাযোগ্য

সম্মান দিয়া নিজের দরবারে রাখিয়াছিলেন। তাঁহার দরবারে ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক গায়িকা ছিলেন যথা—হিন্দু, ইরানী, তুরানী, কাশ্মীরী। আকবরের দরবারে ভিন্ন ভিন্ন দেশের এবং ভিন্ন ভিন্ন জাতির গায়ক ও বাদকের মোট সংখ্যা ছত্রিশ জন ছিল। তন্মধ্যে তানসেন (তন্নামিশ্র), নায়ক বৈজু, রামদাস, বজবাহাদুর (মালব দেশের রাজা), তানতরঙ্গ খাঁ প্রভৃতির নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহা ছাড়া তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়কগায়িকাদের মধ্যে বৃন্দাবন নিবাসী স্বামী হরিদাস (ইনি তানসেন এবং বৈজুর গুরু এবং তৎকালের শ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন), বজবাহাদুরের স্ত্রী রাণী রূপমতী এবং উদয়পুরের হীরাবাঈয়ের নামও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। আকবর শুধু সংগীত প্রেমিক ছিলেন না পরন্তু নিজেও সংগীতের যথেষ্ট চর্চ্চা করিয়াছিলেন। সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার এত জ্ঞান ছিল যে অনেক বড় বড় গায়ক বাদকগণ ও এ বিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ ছিলেন না। আকবরের দরবারে তানসেন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গায়ক ছিলেন। তাঁহার রাজত্বের পূর্ববর্ত্তী হাজার বৎসরের মধ্যে এতবড় গায়ক কেহ ছিলেন না। তানসেন কয়েকটি নূতন রাগ সৃষ্টি করেন যথা—দরবারীকানাড়া, মিয়াঁকীমল্লার, মিয়াঁকী-সারঙ্গ ইত্যাদি। নায়ক বৈজু তানসেনের পরেই উল্লেখযোগ্য গায়ক ছিলেন। তিনিও কয়েকটি রাগ সৃষ্টি করেন যথা—লঙ্কধন-সারঙ্গ, ধুলিয়া-মল্লার ইত্যাদি। এই প্রকার রামদাস 'রামদাসি-মল্লার এবং হরিদাস 'জোগিয়া' রাগ আবিষ্কার করেন। এই প্রকারে আকবরের সময়ে প্রচলিত রাগকে সামান্য পরিমানে পরিবর্তন করিয়া নূতন নূতন রাগের সৃষ্টি হইয়াছিল।

আকবরের সময় গোয়ালিয়র, পান্না, মালওয়া প্রভৃতি দেশীয় রাজ্যেও অনেক প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। তাঁহারা মাঝে মাঝে আসিয়া আকবরের দরবারে গান গাহিয়া যাইতেন। ইহাদের মধ্যে গোয়ালিয়রের রাজা মান-তোমর বিশেষ সংগীত প্রেমিক ছিলেন। সংগীতবিদ্‌দের মত এই যে রাজা মান-তোমরই সর্ব্বপ্রথম ধ্রুবপদ গানের সৃষ্টি করেন। ইনি যে

ধ্রুবপদ গান রচনা করেন ঐ সব গান আজ পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে। ইনি গুজরী, বহুল গুজরী, মাল গুজরী, মঙ্গল্ গুজরী প্রভৃতি সংকীর্ণ রাগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন। কেহ কেহ বলেন ধ্রুবপদ গান রাজা মানের পূর্ব্বেই প্রচলিত ছিল। যদিও ইহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না যে ধ্রুবপদ গান সর্বপ্রথম কে রচনা করেন তথাপি ইহা বলা যায় যে অনুমান পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে ধ্রুবপদ গান প্রচলিত হয় এবং ইহাও বলা অসমীচীন নহে যে রাজা মানই সর্ব্ব-প্রথম ধ্রুবপদ গানকে বহুল ভাবে প্রচার করেন। এই সময়ে আকবরের দরবারের পুণ্ডরীক বিটল নামক জনৈক সংগীত বিদ্বান্ 'সদ্‌রাগ চন্দ্রোদয়', 'রাগ মালা' 'রাগ মঞ্জরী' এবং 'নর্তন-নির্ণয়ন' নামক চারিখানা পুস্তক রচনা করেন। ইনি মোট বাইশটি ঠাটকে মানিয়া যাবতীয় রাগকে উহার অন্তর্ভুক্ত করেন। 'সদ্‌রাগ-চন্দ্রোদয়ে' উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতির সংগীতের বর্ণনা আছে। এ সময়ে রামামাত্য নামে আর একজন সংগীত কলাবিদ 'স্বরমেল-কলানিধি' নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে উত্তর এবং দক্ষিণ উভয় পদ্ধতি সংগীতের বিস্তৃত বর্ণনা আছে।

জাহাঙ্গীরের সময়—সপ্তদশ শতাব্দী

জাহাঙ্গীর বিশেষ সংগীত প্রেমিক ছিলেন না। কাজেই তিনি সংগীতের উন্নতির জন্য চেষ্টা করেন নাই। তাঁহার দরবারে জাহাঙ্গীর দাদ, ছতর খাঁ, পূরবেজ দাদ এবং খুর ম দাদ প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এই সময়ে রাজমুন্দ্রী নিবাসী তেলেগু ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সোমনাথ দক্ষিণী পদ্ধতিতে 'রাগবিবোধ' নামক একখানি সংগীত পুস্তক প্রণয়ন করেন। ইহাতে কয়েক প্রকার বীণার বর্ণনা এবং উহা বাজাইবার রীতি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে এবং দাক্ষিণাত্যের জনকজন্য পদ্ধতি অনুসারে রাগের বর্গীকরণ করা হইয়াছে। এই সময়ে পণ্ডিত দামোদর মিশ্র হিন্দুস্থানী সংগীতপদ্ধতিতে 'সংগীত দর্পণ' নামক একখানি পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকে অন্যান্য প্রসঙ্গের সহিত তিনি বিভিন্ন রাগকে মূর্ত্তি রূপে কল্পনা করেন।

সাজাহানের সময়—সপ্তদশ শতাব্দী

সাজাহান সঙ্গীতের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তিনি স্বয়ং সংগীতজ্ঞ ছিলেন এবং প্রায়ই সংগীতাদি শুনিতেন। তিনি উর্দু ভাষার গানে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। ধর্ম্মাত্মা ব্যক্তিগণ তাঁহার চিত্তাকর্ষক সংগীত শ্রবণে মুগ্ধ হইয়া যাইতেন। তাঁহার দরবারে প্রসিদ্ধ গায়কদের মধ্যে রামদাস মহাপট্টর, জগন্নাথ লালখাঁ এবং দৈরঙ্গ খাঁর নাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য।

সংগীত পারিজাত

এই সময়ে পণ্ডিত অহোবল নামক একজন সংগীতজ্ঞ হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে 'সংগীত পারিজাত' গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। পণ্ডিত অহোবল প্রথমতঃ বীণার তারের দৈর্ঘ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন স্থানে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরস্থান নির্ণয় করেন। অতঃপর পণ্ডিত হৃদয় নারায়ণ 'হৃদয়-কৌতুক', 'হৃদয়-প্রকাশ' নামক দুইখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং অহোবলের ন্যায় বীণার তারের দৈর্ঘ্যের উপর ভিন্ন ভিন্ন শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করেন।

ঔরঙ্গজেবের সময় ১৬৫৮—১৭০৭

সংগীতের উপর ঔরঙ্গজেবের বড় বিদ্বেষ ছিল। তিনি নিজের দরবার হইতে সমস্ত গায়কদের বহিষ্কৃত করেন এবং সকল প্রকার সংগীত চর্চা বন্ধ করেন। তিনি তাঁহার সাম্রাজ্যের ভিতর সংগীতানুষ্ঠান কঠোর নির্দ্দেশ দ্বারা বন্ধ করিয়া দেন। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে পণ্ডিত বেংকট-মখী নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ "চতুর্দণ্ডী-প্রকাশিকা" নামক একখানি পুস্তক প্রণয়ন করেন এবং সর্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত প্রচার করেন যে সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত স্বরের সাহায্যে মোট ৭২টি ঠাট হইতে পারে।

একই সময়ে পণ্ডিত ভাবভট্ট হিন্দুস্থানী পদ্ধতিতে 'অনুপবিলাস' 'অনুপাঙ্কুশ' এবং 'অনুপসংগীত রত্নাকর' নামক তিনখানা পুস্তক রচনা করেন।

মুহম্মদ শাহের সময় ১৭১৯ খৃঃ—মুহম্মদ শাহ সর্বশেষ মোগল বাদশাহ ছিলেন। তিনি অত্যন্ত সংগীত প্রেমিক ছিলেন। তাঁহার নামে বহু গান বর্তমান কাল পর্যন্ত প্রচলিত আছে। ইঁহার দরবারে অদারঙ্গ এবং সদারঙ্গ নামক দুইজন প্রসিদ্ধ গায়ক ছিলেন। এই দুই ভাই খেয়াল গানের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করেন। তাঁহারা কয়েক হাজার খেয়াল গান রচনা করেন। তাঁহাদের রচিত খেয়াল গান বর্তমান কাল পর্যন্ত হিন্দুস্থানে গাওয়া হইয়া থাকে। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন অদারঙ্গ এবং সদারঙ্গই সর্বপ্রথম কলওয়াবন্তী অর্থাৎ বড় খেয়াল আবিষ্কার করেন। পরন্তু কাহারো কাহারো মতে জৌনপুরের সুলতান হোসেন শর্কীই সর্বপ্রথম ঐ প্রকার খেয়ালের আবিষ্কার করেন। যাহাই হউক না কেন সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গই খেয়াল গানকে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া লোকপ্রিয় করেন।

ঐ সময়ে লক্ষ্ণৌর প্রসিদ্ধ কওয়াল গুলাম্ রসুল শোরীর পুত্র গুলাম্ নবী শোরী টপ্পাগানের সৃষ্টি করেন।

রাগতত্ত্ব বিবোধ

এই সময়ে অর্থাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্দ্ধে পণ্ডিত শ্রীনিবাস 'রাগতত্ত্ব বিবোধ' নামক প্রসিদ্ধ সংগীত পুস্তক রচনা করেন। ইনিও পণ্ডিত অহোবলের ন্যায় বীণার তারের বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের উপর বারটি স্বরের স্থান নির্ণয় করেন। পণ্ডিত শ্রীনিবাসের শুদ্ধ ঠাট বর্তমানের কাফী ঠাটের ন্যায় যথা—সা রে গ্ ম প ধ নি্ র্সা। মধ্যকালীন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারগণের মধ্যে তিনি সর্বশেষ গ্রন্থকার।

ঐ সময়ে তাঞ্জোর রাজ্যের মারাঠা রাজা তুলাজীরাও ভোঁসলে সংগীত শাস্ত্রের প্রতি বিশেষ যত্ন নেন। তিনি 'সংগীত সারামৃতম্' নামক দক্ষিণ পদ্ধতির একখানি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন।

ইংরাজ যুগ

ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভে দেশীয় রাজ্যের মধ্যেই সংগীতের প্রচার বিশেষ ভাবে সীমাবদ্ধ ছিল। ইংরাজী শিক্ষার প্রভাবে দেশীয় নৃপতিগণ ক্রমশই সংগীতের প্রতি উদাসীন হইয়া পড়েন। ফলে সংগীত বিদ্যার এতদূর অধঃপতন হয় যে শিক্ষিত সমাজ সংগীত চর্চা করিতে বিশেষ সংকোচ বোধ করিতে আরম্ভ করেন এবং বিশেষ বিশেষ পরিবারে সংগীতের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ হইয়া যায়। পুনরায় স্যার উইলিয়ম জোনস্, ক্যাপটেন্ উইলার্ড ইত্যাদি সংগীত শাস্ত্রের প্রতি মনোনিবেশ করেন এবং যথেষ্ট অধ্যয়ন করেন। ইংরাজী ১৮১৩ খৃষ্টাব্দে পাটনার অধিবাসী মুহম্মদ রজা নামক জনৈক সংগীতজ্ঞ 'নগ্‌মাতে-আস্‌ফী' নামক একখানা সংগীতের পুস্তক রচনা করেন। উহাতে তিনি প্রচলিত রাগ রাগিণী, পুত্ররাগ, পুত্রবধূ ইত্যাদি পদ্ধতিকে অবৈজ্ঞানিক তথা অশুদ্ধ প্রমাণিত করিয়া উহার পরিবর্তে ঠাট রাগ পদ্ধতি স্বীকার করিয়া লইয়াছেন। শুধু ইহাই নয় তিনি বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া স্বীকার করেন এবং রাগের বর্গী করণ ঠাট রাগ পদ্ধতি অনুসারে স্বীকার করিয়া লন।

ইহার পর জয়পুরের মহারাজা প্রতাপ সিংহ (১৭৩৯—১৮০৪ খৃঃ) হিন্দুস্থানী সংগীতের একখানি সর্বমান্য পুস্তক লিখিবার অভিপ্রায়ে ভারত-বর্ষের প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীত বিশেষজ্ঞদিগকে একটি সংগীত সম্মেলনে আহ্বান করেন। সম্মেলন শেষ হইবার কিছুদিন পরে 'সংগীত-সার' নামক একখানি পুস্তক রচনা করা হয়। উহাতে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট বলিয়া মানা হয়। ১৮৪২ খৃষ্টাব্দে কৃষ্ণানন্দ ব্যাস 'সংগীত কল্পদ্রুম' নামক একখানি সংগীত গ্রন্থ রচনা করেন। উহাতে কেবল মাত্র গান লেখা আছে স্বরলিপি নাই।

তৎকালে যখন উত্তর ভারতের রাগের বর্গী করণ এক নূতন পদ্ধতিতে হইতেছিল তখন দাক্ষিণাত্যের তাঞ্জোর দেশকে ওখানকার সংগীতের কেন্দ্রস্থান বলিয়া মানা হইত। ঐ সময়ে দাক্ষিণাত্যে ত্যাগরাজ, শ্যাম

শাস্ত্রী, সুবরাম দিক্ষিত প্রভৃতি বহু প্রসিদ্ধ গায়ক এবং সংগীতজ্ঞদের আবির্ভাব হয়। বাংলা দেশেও তৎকালে রাজা এস্ এম্ ঠাকুর এবং অন্যান্য কয়েক জন সংগীত বিদ্বান্ রাগরাগিণী-পদ্ধতি মানিয়া লইয়া উক্ত পদ্ধতিতে কয়েকখানা পুস্তক রচনা করেন।

পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণুনারায়ণ ভাতখণ্ডে

অতঃপর বোম্বাইয়ের একজন প্রসিদ্ধ সংগীত বিদ্বান্ পণ্ডিত শ্রীবিষ্ণু-নারায়ণ ভাতখণ্ডে সংগীত শাস্ত্রের উন্নয়নের প্রতি বিশেষ যত্নবান্ হন। ইনি ভারতবর্ষের অসংখ্য সহর এবং দেশীয় রাজ্যে ভ্রমণ করিয়া বহু অর্থব্যয়ে এবং অশেষ কষ্ট ও লাঞ্ছনা বরণ করিয়া বিখ্যাত সংগীতজ্ঞদের নিকট হইতে গান শুনিয়া, শিখিয়া ও উহার স্বরলিপি করিয়া ছয়টি খণ্ডে 'ক্রমিক পুস্তক' নামে প্রসিদ্ধ সংগীত গ্রন্থ প্রনয়ণ করেন। ইহা ছাড়া ভারতীয় সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে চারখণ্ডে বিভক্ত "সংগীত পদ্ধতি" নামক গ্রন্থ এবং সংস্কৃতে "অভিনব রাগমঞ্জরী" ও "লক্ষ্মণ সংগীত" নামক দুই খানা পুস্তক রচনা করেন। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে বিলাবল ঠাটকে শুদ্ধ ঠাট মানিয়া লইয়াছেন এবং ঠাট-রাগ পদ্ধতি স্বীকার করিয়া মোট দশ ঠাটের অন্তর্গত সমুদয় রাগকে সমাবেশ করিয়াছেন। ইহা ছাড়া সংগীত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, বেণারস প্রভৃতি স্থানে সংগীত সম্মেলন আহ্বান করেন।

শুধু তাহাই নহে সংগীতের যথোচিত প্রচারের জন্য তিনি বরোদা, লক্ষ্ণৌ এবং গোয়ালিয়রে তিনটি সংগীত মহাবিদ্যালয় স্থাপন করেন। উপরোক্ত কার্যাবলীর জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডকে বর্তমান ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের জনক বলা হয়। ভারতীয় সংগীতের ইতিহাসে তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

গত কয়েক বৎসর যাবৎ ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সংগীতের প্রচার দ্রুততর গতিতে হইতেছে। স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে দেশের শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সংগীত বিদ্যার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করিয়া উহার চর্চ্চা আরম্ভ

করিয়াছেন। সাধারণ শিক্ষায়তনের কর্ত্তৃপক্ষেরাও সংগীতের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিয়া আপন আপন প্রতিষ্ঠানে সংগীত শিক্ষা দানের সুব্যবস্থা করিতেছেন। আজকাল ভারতের অধিকাংশ বড় সহরেই মধ্যে মধ্যে সংগীতের সম্মেলন হইয়া থাকে। পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ সংগীত মহাবিদ্যালয়টি তাঁহার পুণ্যস্মৃতি রক্ষার্থে 'ভাতখণ্ডে সংগীত বিদ্যাপীঠ' নামে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কয়েকটী মহাবিদ্যালয় রহিয়াছে, তন্মধ্যে লক্ষ্ণৌ মরিস্ কলেজ অব্ হিন্দুস্থানী মিউজিক্, চতুর সংগীত মহাবিদ্যালয় নাগপুর, ভারতীয় সংগীত শিক্ষাপীঠ বোম্বাই, ভারতীয় সংগীত বিদ্যালয় দিল্লী, লুকারগঞ্জ সংগীত বিদ্যালয় এলাহাবাদ, বঙ্গদেশে বেঙ্গল মিউজিক্ কলেজ, অল্ ইণ্ডিয়া মিউজিক্ কলেজ, আর্য সংগীত বিদ্যাপীঠ এবং রামকৃষ্ণ সুর ভারতী শিউড়ি, অন্যতম। উপরোক্ত মহাবিদ্যালয় সমূহে অসংখ্য উচ্চশিক্ষিত এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের ছেলেমেয়েরা সংগীত শিক্ষা লাভ করিতেছে। আশা করা যায় যে সকলের সমবেত চেষ্টায় ভারতীয় সংগীত পুনরায় তাহার পূর্ব মর্যাদা ফিরিয়া পাইবে এবং গরিমার উচ্চ শিখরে উপনীত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সঙ্গীত

স্বর সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা প্রাণী মাত্রেরই চিত্ত প্রসন্ন করিতে সমর্থ তাহাকে সংগীত বলা হয়। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি অনুসারে সংগীতের পরিভাষা নিম্নে দেওয়া হইল ঃ—

"গীতং বাদ্যং তথা নৃত্যং ত্রয়ং সংগীতমুচ্যতে"

—'সংগীত রত্নাকর'।

অর্থাৎ 'গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটির সমাবেশকে সংগীত বলা হয়'।

গীত—স্বর, অর্থযুক্ত শব্দ এবং তালের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করাকে গীত বলে।

বাদ্য—স্বর এবং তাল সহযোগে যে যন্ত্রের সাহায্যে মনের ভাব প্রকাশ করা যায় তাহাকে বাদ্য বলে।

নৃত্য—ছন্দ সহযোগে সুললিত অঙ্গ ভঙ্গীর দ্বারা মনের ভাব প্রকাশ করাকে নৃত্য বলে।

প্রকৃতপক্ষে গীত, বাদ্য এবং নৃত্য এই তিনটি স্বতন্ত্র জিনিষ। উপরোক্ত তিনটির মধ্যে গানকেই সর্বপ্রধান কলা বলিয়া মানা হয়। 'সংগীত' এই শব্দটির মধ্যেই তিনটি কলার সমাবেশ করা হইয়াছে। সংগীত শব্দটি গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটির সমাবেশ কাজেই সংগীত শাস্ত্রকে গীতাধ্যায়, বাদ্যাধ্যায় ও নৃত্যাধ্যায় প্রধানতঃ এই তিন ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। উক্ত তিনটি অধ্যায় একত্রে তৌর্য্যত্রিক বলিয়া অভিহিত। তৌর্য্যত্রিক দুইভাগে বিভক্ত যথা ঃ—ঔপপত্তিক অর্থাৎ সংগীত শাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞান

(Theoretical knowledge of music) এবং ক্রিয়াসিদ্ধ অর্থাৎ কণ্ঠ, যন্ত্র এবং সুললিত অঙ্গভঙ্গীর সাহায্যে গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের অনুশীলন অথবা নৈপুণ্য প্রদর্শন (Practical knowledge of music)।

ধনী, দরিদ্র, বিদ্বান্, মূর্খ, রাজপ্রাসাদ অথবা দরিদ্রের কুটীর সর্বত্রই সংগীত সমভাবে সম্মানিত ও আদৃত হয়। এক কথায় সংগীত সম্বন্ধে যে কোনরূপ প্রশংসাই অকিঞ্চিৎকর। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নারদকে সংগীত সম্বন্ধে এইরূপ বলিয়াছেন :—

নাহং তিষ্ঠামি বৈকুণ্ঠে যোগীনাং হৃদয়ে ন চ।
মদ্‌ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥

অর্থাৎ হে নারদ, আমি বৈকুণ্ঠে কিংবা যোগীদের হৃদয়ে অবস্থান করি না। যেখানে আমার ভক্তগণ গান করেন আমি সে স্থানেই থাকি।

সংগীত সম্বন্ধে বলিতে গিয়া মহাকবি সেক্স্‌পিয়ার একস্থানে বলিয়াছেন যে 'যে মানুষের সংগীতে রুচি নাই, সংগীতের বিশ্বসম্মোহিনী স্বর যাহাকে মুগ্ধ করে না সে পতিত, বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মদ্রোহী। অমাবস্যা রজনীর সূচীভেদ্য অন্ধকারের অপেক্ষা তাহার হৃদয় অধিকতর ভয়ঙ্কর।

অল্প কথায় সংগীত প্রাণীমাত্রেরই জীবনের অমৃতময়ী ধারা।

সঙ্গীত-পদ্ধতি

ভারতবর্ষে দুই প্রকার সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে, যথা :— উত্তর ভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি এবং দক্ষিণ ভারতীয় অথবা কর্ণাটী পদ্ধতি।

উত্তর ভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি :—বিন্ধ্যপর্বতের উত্তরে সমগ্র ভারতবর্ষে অর্থাৎ আর্যাবর্ত্তে যে সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাকে উত্তর ভারতীয় অথবা হিন্দুস্থানী পদ্ধতি বলা হয়।

দক্ষিণ ভারতীয় অথবা কর্ণাটী পদ্ধতি ঃ—বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণে সমগ্র মাদ্রাজ প্রদেশ ও মহীশূরে যে সংগীত পদ্ধতি প্রচলিত আছে তাহাকে দক্ষিণ ভারতীয় অথবা কর্ণাটী পদ্ধতি বলা হয়।

ভারতবর্ষে প্রচলিত দুইটি সংগীত পদ্ধতির তুলনামূলক সমালোচনা।

সাদৃশ্য

১। উভয় পদ্ধতিই প্রাচীনকাল হইতে প্রচলিত আছে।

২। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই মধ্য সপ্তকের 'সা' হইতে তার সপ্তকের 'সাঁ' এর অন্তর্গত বারটি স্বর মানা হয় যথা ঃ—সা রে রে গ গ ম ম' প ধ ধ নি নি সাঁ ।

৩। উভয় পদ্ধতি অনুসারেই সপ্তকের অন্তর্গত সাতটি শুদ্ধ এবং পাঁচটি বিকৃত স্বর হইতে সমুদয় ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে।

৪। উভয় পদ্ধতিতেই জনক-জন্য অথবা ঠাট রাগ পদ্ধতি স্বীকৃত হইয়াছে।

বৈসাদৃশ্য

উত্তরী পদ্ধতি	দক্ষিণী পদ্ধতি
১। শুদ্ধ ঠাট বিলাবল।	১। শুদ্ধ ঠাট কনকাঙ্গি।
২। মোট দশটি ঠাট মানা হয়।	২। মোট ৭২টি ঠাট মানা হয়।
৩। তাল পদ্ধতি ভিন্ন।	৩। তাল পদ্ধতি ভিন্ন।
৪। আলাপ গান এবং গমক প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন প্রকারের।	৪। আলাপ গান এবং গমক প্রভৃতির প্রয়োগ ভিন্ন প্রকারের।
৫। ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন প্রকারের।	৫। ১২টি স্বরের নাম ভিন্ন প্রকারের।

নাদ

'ন'কার অর্থাৎ প্রাণ এবং 'দ'কার অর্থাৎ অগ্নি এই উভয়ের সংযোগে নাদের উৎপত্তি হয়। সংগীতের সম্বন্ধ আওয়াজের সহিত। এই আওয়াজ দুই প্রকারের হইতে পারে। প্রথমটি সংগীত উপযোগী এবং দ্বিতীয়টী

সংগীতের অনুপযোগী। প্রথমোক্ত অর্থাৎ সংগীতের উপযোগী আওয়াজ-কেই নাদ বলা হয়।

নাদের তিন প্রকার অবস্থা আছে যথা :—রূপভেদ, জাতিভেদ এবং উচ্চনীচতাভেদ।

নাদের রূপভেদ—একই নাদ অনুচ্চস্বরে অথবা উচ্চস্বরে উচ্চারণ করা যায়। 'সা' এই স্বরটিকে আস্তে কিংবা জোরে উভয় প্রকারেই গাওয়া যায়। নাদের এইরূপ প্রকার ভেদকে নাদের রূপভেদ অথবা বড় হওয়া এবং ছোট হওয়া বলা হয়।

নাদের জাতি ভেদ—নাদের জাতির সাহায্যে আমরা উহা মনুষ্য কণ্ঠ নিঃসৃত অথবা বাদ্যযন্ত্র হইতে উদ্ভূত তাহা নাদের উৎপত্তি স্থল না দেখিয়াই বুঝিতে পারি।

নাদের উচ্চনীচতা ভেদ—নাদের উচ্চনীচতার সাহায্যে আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্বর পাইয়া থাকি। উপরোক্ত উচ্চনীচতা প্রতি মুহূর্ত্তের আন্দোলনের উপর নির্ভর করে। আন্দোলন যত অধিক হইবে স্বর তত উঁচু হইবে আন্দোলন যত কম হইবে স্বর তত নীচু হইবে।

শ্রুতি, স্বর ও সপ্তক

শ্রুতি কাহাকে বলে?

নিত্যং গীতোপযোগিত্বমভিজ্ঞেয়ত্বমপ্যূত।
লক্ষ্যে প্রোক্তং সুপর্যাপ্তং সংগীতশ্রুতিলক্ষণম্॥

'অভিনব রাগমঞ্জরী'

অর্থাৎ সংগীত উপযোগী যে আওয়াজ তাহাদের পরস্পরের পার্থক্য সহ স্পষ্ট শ্রুত হয় তাহাকে শ্রুতি বলা হয়।

—স্বর—

সংগীত উপযোগী শ্রুতি মধুর আওয়াজকে স্বর বলে। প্রাচীন এবং আধুনিক সংগীত গ্রন্থকারগণ 'সা' হইতে 'র্সা' পর্যন্ত মোট ২২টি শ্রুতি

মানিয়া লইয়া উক্ত শ্রুতির বিভিন্ন স্থানে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং ৫টি বিকৃত স্বরের স্থান নির্ণয় করিয়াছেন। ৭টি শুদ্ধ স্বর যথাক্রমে ষড়জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ এই নামে লিখিত ও পঠিত হয়। ৭টি শুদ্ধ স্বরের শ্রুতি সংখ্যা নির্ধারণের জন্য প্রাচীন এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ নিম্নলিখিত নিয়ম মানিয়া লইয়াছেন।

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়্জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রী ঋষভধৈবতৌ॥

অর্থাৎ ষড়জ, মধ্যম এবং পঞ্চম এই তিনটি স্বরের চারিটি করিয়া, নিষাদ এবং গান্ধারের দুইটি করিয়া এবং ঋষভ এবং ধৈবতের দিকে তিনটি করিয়া শ্রুতি আছে।

শুদ্ধ স্বরের শ্রুতি সংখ্যা বিষয়ে প্রাচীন, মধ্যকালীন এবং আধুনিক গ্রন্থকারগণ একমত হইলেও প্রাচীন এবং মধ্যকালীন গ্রন্থকারগণ প্রত্যেক স্বরকে উহার অন্তিম শ্রুতির উপর স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে চতুর্থ শ্রুতির উপর ষড়জ, সপ্তম শ্রুতির উপর ঋষভ, নবম শ্রুতির উপর গান্ধার, ত্রয়োদশ শ্রুতির উপর মধ্যম, সপ্তদশ শ্রুতির উপর পঞ্চম, বিংশতি শ্রুতির উপর ধৈবত এবং দ্বাবিংশতি শ্রুতির উপর নিষাদ অবস্থিত। আধুনিক গ্রন্থকারের মতে প্রথম শ্রুতির উপর ষড়জ, পঞ্চম শ্রুতির উপর ঋষভ, অষ্টম শ্রুতির উপর গান্ধার, দশম শ্রুতির উপর মধ্যম, চতুর্দশ শ্রুতির উপর পঞ্চম, অষ্টাদশ শ্রুতির উপর ধৈবত এবং একবিংশতি শ্রুতির উপর নিষাদ অবস্থিত।

সপ্তক

সপ্তক কাহাকে বলে ?

'সা' হইতে 'নি' পর্যন্ত ৭টি শুদ্ধ স্বর ক্রমানুসারে লিখিত অথবা সংগীতে ব্যবহৃত হইলে উহাকে 'সপ্তক' বলা হয়।

নাদস্থান কাহাকে বলে ?

উচ্চনীচতা অনুসারে নাদের তিনটি স্থান মানা হয়, যথা ঃ—মন্দ্র, মধ্য এবং তার। এই তিনটি স্থানকেই নাদস্থান বলা হয়। উপরোক্ত তিনটি নাদস্থানে এক একটি স্বর সপ্তক মানিয়া লইয়া উহাদিগকে 'মন্দ্র-স্বর-সপ্তক' 'মধ্য-স্বর-সপ্তক' এবং 'তার-স্বর-সপ্তক' বলিয়া অভিহিত করা হইয়াছে।

'অভিনব রাগমঞ্জরী'তে সপ্তকের স্বরস্থান নির্ণয়ের সম্বন্ধে এইরূপ বলা হইয়াছে যথা ঃ—

প্রথমং সপ্তকং মন্দ্রং দ্বিতীয়ং মধ্যমং স্মৃতম্।
তৃতীয়ং তারসংজ্ঞংস্যাদেবং স্থানত্রয়ম্ মতম্॥

অর্থাৎ প্রথম সপ্তককে মন্দ্র সপ্তক, দ্বিতীয় সপ্তককে মধ্য-সপ্তক এবং তৃতীয় সপ্তককে তার-সপ্তক বলা হয়। এই প্রকারে তিনটি সপ্তক মানা হয়।

মন্দ্র-সপ্তকের স্বরের উচ্চারণে হৃদয়ে, মধ্য-সপ্তক স্বরের উচ্চারণে কণ্ঠে এবং তার-সপ্তক স্বরের উচ্চারণে তালুতে বিশেষ জোর লাগে।

মন্দ্র-সপ্তক—যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্য-সপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ নীচে হয় তাহাকে মন্দ্র-সপ্তক বলে।

মধ্য-সপ্তক—যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মন্দ্র-সপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ উচ্চে হয় তাহাকে মধ্য-সপ্তক বলা হয়।

তার-সপ্তক—যে সপ্তকের স্বরের আওয়াজ মধ্য-সপ্তকের স্বরের দ্বিগুণ উঁচুতে হয় তাহাকে তার-সপ্তক বলা হয়।

সাধারণতঃ আমরা যে আওয়াজে কথাবার্তা বলি তাহাকে ভিত্তি করিয়া একটি সপ্তক রচনা করিলে তাহাকে মধ্য-সপ্তক বলা যায়। মধ্য-সপ্তকের স্বরের কোনও সাংকেতিক চিহ্ন নাই কিন্তু যথাক্রমে নিম্নে এবং উপরে বিন্দু চিহ্নের দ্বারা মন্দ্র এবং তার-স্থান সূচিত হয় যথা ঃ—

মন্দ্র—প় ধ় নি় এবং তার—সাঁ রেঁ গঁ।

তীব্র এবং কোমল স্বর কয়টি ?

শুদ্ধ স্বর অর্থাৎ 'সা রে গ ম প ধ নি'র মধ্যে 'সা' এবং 'প' এই দুইটি স্বর রূপান্তরিত হয় না, কাজেই উহাদিগকে অচল স্বর বলা হয়। কিন্তু রে গ ম ধ এবং নি এই পাঁচটি স্বর রূপান্তরিত হইতে পারে এবং উহাদিগকে সচল স্বর বলা হয়। স্বরকে কথঞ্চিৎ নিম্নে নামাইলে উহাকে কোমল এবং কথঞ্চিৎ উর্দ্ধে উঠাইলে উহাকে তীব্রস্বর বলা হয়। এই প্রকার যদি রে গ ধ এবং নি এই চারিটি শুদ্ধ স্বরকে কথঞ্চিৎ নীচে নামান হয় তবে উহাদিগকে কোমল 'রে গ ধ নি' বলা হয়। উক্ত কোমল অবস্থা হইতে কতকটা উপরে উঠাইলে উহাদিগকে তীব্র অথবা শুদ্ধ 'রে গ ধ নি' বলা হয়। শুদ্ধ 'ম' কে কোমল 'ম' বলা যাইতে পারে এবং উহাকে তীব্র করিতে হইলে কথঞ্চিৎ উপরে উঠাইয়া ঐরূপ করা যায়। অতএব আমাদের সংগীতে পাঁচটি তীব্রস্বর যথা— রে গ ম ধ নি এবং পাঁচটি কোমল স্বর যথাঃ—রে গ ম ধ নি আছে। ইংরাজীতে কোমল স্বরকে Flat Note এবং তীব্র স্বরকে Sharp note বলা হয়।

শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বর কাহাকে বলে ?

সপ্তকের অন্তর্গত ৭টী স্বরকে শুদ্ধ স্বর বলা হয়। তন্মধ্যে 'রে গ ম ধ এবং নি' এই পাঁচটি স্বরকে রূপান্তরিত করা হইলে কোমল রে গ ধ নি এবং তীব্র ম হয়। উহাদিগকে বিকৃত স্বর বলা হয়।

উপরোক্ত উদাহরণে ইহাই প্রমাণিত হয় যে শুদ্ধ স্বরকে তাহার নিয়মিত স্থান হইতে উঁচু কিংবা নীচু করিলে উহা বিকৃত স্বরে পরিণত হয়।

রে গ ধ নি এবং ম এই পাঁচটি স্বর বিকৃত হইলে উহাদিগকে যথাক্রমে কোমল রে গ ধ নি এবং তীব্র ম বলা হয়। উপরোক্ত বর্ণনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সপ্তকের অন্তর্গত মোট ১২টী স্বর আছে যথাঃ— সা রে রে গ গ ম ম প ধ ধ নি নি। হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে কোমল এবং বিকৃত স্বরের সাংকেতিক চিহ্ন যথাক্রমে '—' এবং '।'

মানা হয়। শুদ্ধ 'ম'কে কোমল 'ম' বলা হয় কাজেই কোমল 'ম' লিখিতে হইলে উপরোক্ত কোমল চিহ্নের প্রয়োজন নাই।

ইদানীং হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতি অনুসারে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বরের শ্রুতি স্থানের পরিচয় নিম্নলিখিত রূপে দেওয়া যায়।

শ্রুতির নং—

১	সা	শুদ্ধ	অবিকৃত (অচল)
৩	রে̱	কোমল	বিকৃত
৫	রে	শুদ্ধ (তীব্র)	অবিকৃত
৭	গ̱	কোমল	বিকৃত
৮	গ	শুদ্ধ (তীব্র)	অবিকৃত
১০	ম	শুদ্ধ (কোমল)	অবিকৃত
১২	ম॑	(তীব্র)	বিকৃত
১৪	প	শুদ্ধ	অবিকৃত (অচল)
১৬	ধ̱	কোমল	বিকৃত
১৮	ধ	শুদ্ধ (তীব্র)	অবিকৃত
২০	নি̱	কোমল	বিকৃত
২১	নি	শুদ্ধ (তীব্র)	অবিকৃত
১	সা̇	শুদ্ধ	অবিকৃত (অচল)

ঠাট

নাদ হইতে শ্রুতি, শ্রুতি হইতে স্বর এবং স্বর হইতে ঠাটের উৎপত্তি হইয়াছে। পূর্বেই বলা হইয়াছে সপ্তকে শুদ্ধ এবং বিকৃত স্বর মোট ১২টি আছে। সপ্তকের অন্তর্গত উক্ত ১২টি স্বর হইতেই ঠাট উৎপন্ন হইয়াছে।

ঠাট কাহাকে বলে ?

স্বর সমূহের যে বিশিষ্ট রচনা রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ তাহাকে ঠাট বলে। সংস্কৃত গ্রন্থকার ঠাটের নিম্নোক্ত বর্ণনা করিয়াছেন।

মেলঃ স্বর সমূহঃ স্যাদ্রাগব্যঞ্জন শক্তিমান্।

অর্থাৎ ঃ—মেল অথবা ঠাট স্বর সমূহের বিশেষ রচনা যাহা রাগ উৎপন্ন করিতে সমর্থ।

প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে সপ্তকের ১২টী স্বর হইতে মোট ৭২টি ঠাট উৎপন্ন হইতে পারে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যাংকটমখীই সর্বপ্রথম উপরোক্ত ৭২টি ঠাট সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত প্রচার করেন। উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে হিন্দুস্থানী সংগীতে ১০টি ঠাট মানা হয়। যথা ঃ—কল্যাণ ঠাট, বিলাবল ঠাট, খমাজ ঠাট, ভৈরব ঠাট, পূর্বী ঠাট, মারবা ঠাট, কাফী ঠাট, আসাবরী ঠাট, ভৈরবী ঠাট এবং তোড়ী ঠাট।

ঠাট সম্বন্ধে কতিপয় জ্ঞাতব্য বিষয়

১। ঠাটে সব সময়ই ৮টি স্বর থাকিবে। যথা ঃ—সা রে গ ম প ধ নি র্সা।

২। ঠাটের অন্তর্গত ৮টি স্বর সা রে গ ম প ধ নি র্সা এই নাম এবং ক্রমানুসারে হইবে।

৩। ঠাটে অবরোহের আবশ্যকতা নাই।

৪। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই।

৫। কোনও ঠাট উহা হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত হয়। যথা ঃ—ভৈরব ঠাট হইতে ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইয়াছে। তন্মধ্যে ভৈরব ঠাট ভৈরব রাগের নামে পরিচিত।

বর্ণ—গানের প্রত্যক্ষ ক্রিয়াকে বর্ণ বলা হয়। বর্ণ ৪ প্রকার যথা ঃ—স্থায়ী, আরোহী, অবরোহী এবং সঞ্চারী।

গান ক্রিয়োচ্যতেবর্ণঃ স চতুর্ধা নিরূপিতঃ।
স্থায্যারোহ্যবরোহী চ সঞ্চারীত্যথ লক্ষণম্॥

—অভিনব রাগমঞ্জরী।

স্থায়ী বর্ণ—গান বাজনার সময় কোনও স্বরকে পুনঃপুনঃ উচ্চারণ করিলে উহাকে স্থায়ীবর্ণ বলা হয়। যথা ঃ—সা সা সা, রে রে রে ইত্যাদি।

আরোহী বর্ণ—নিম্নের স্বর হইতে ক্রমানুসারে উপরের স্বর প্রয়োগ করিলে সেই স্বরসমূহকে আরোহী বর্ণ বলা হয়। যথা ঃ—সা রে গ ম প ধ নি।

অবরোহী বর্ণ—উপরের স্বর হইতে ক্রমানুসারে নিম্নের স্বর প্রয়োগ করিলে সেই স্বর সমূহকে অবরোহী বর্ণ বলা হয় যথা—নি ধ প ম গ রে সা।

সঞ্চারী বর্ণ—স্থায়ী, আরোহী এবং অবরোহী এই তিন বর্ণের মিশ্রণকে সঞ্চারী বর্ণ বলা হয়। যথা ঃ—রে রে গ ম গ রে সা।

অলঙ্কার—**বিশিষ্ট বর্ণ সন্দর্ভমলংকারম্ প্রচক্ষতে**

নিয়মিত বর্ণ সমূহকে অলঙ্কার বলা হয়। যথা—সা রে গ, রে গ ম, সা ম, রে প, সা প, রে ধ, গ নি ইত্যাদি।

রাগ

যোঽয়ং ধ্বনির্বিশেষস্তু স্বরবর্ণ বিভূষিতঃ।
রঞ্জকো জনচিত্তাণাং স রাগঃ কথিতো বুধৈঃ॥

—সংগীত রত্নাকর।

অর্থাৎ—রাগ ধ্বনির একটি বিশিষ্ট রচনা যাহা স্বর এবং বর্ণের দ্বারা সৌন্দর্য প্রাপ্ত হইয়া জনচিত্ত মুগ্ধ করে।

রাগ সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়

১। রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়।
২। রাগে ৭টী, ৬টী কিংবা পাঁচটি স্বর থাকিবে।
৩। রাগে আরোহ এবং অবরোহ উভয়ই আছে।

৪। কোনও রাগে ম এবং প এই দুইটী স্বর একই সময়ে বর্জ্জিত হয় না।

৫। রাগ সর্বদাই রঞ্জকতা পূর্ণ হইবে।

৬। সাধারণতঃ রাগে একই স্বরের দুই রূপ অর্থাৎ কোমল এবং তীব্র পরপর ব্যবহার করা হয় না কিন্তু কোন কোন রাগে ঐ প্রকার ব্যবহার দেখা যায়, যথা ঃ—

কেদার—সা ম, ম্ঁ প ধ প।

ললিত—নি় রে় গ ম ম্ঁ ম।

বেহাগ—প ম্ঁ ম গ নি় সা।

৭। রাগ নিজের নামে পরিচিত।

রাগের জাতি

কোন ও রাগে আরোহে এবং অবরোহে ব্যবহৃত স্বর সংখ্যা অনুসারে রাগের জাতি নির্ণীত হয়। সাধারণতঃ রাগ তিন জাতীয় যথা—ঔড়ব অর্থাৎ ৫ স্বর বিশিষ্ট, ষাড়ব অর্থাৎ ৬ স্বর বিশিষ্ট এবং সম্পূর্ণ অর্থাৎ ৭ স্বর বিশিষ্ট কিন্তু আরোহ এবং অবরোহের স্বরসংখ্যানুপাতে রাগ নয় প্রকারের যথা—

	আরোহ	অবরোহ
১।	সম্পূর্ণ	সম্পূর্ণ
২।	”	ষাড়ব
৩।	”	ঔড়ব
৪।	ষাড়ব	সম্পূর্ণ
৫।	”	ষাড়ব
৬।	”	ঔড়ব
৭।	ঔড়ব	সম্পূর্ণ
৮।	”	ষাড়ব
৯।	”	ঔড়ব

আশ্রয় রাগ অর্থাৎ যে রাগ অন্য রাগকে আশ্রয় দেয় তাহাকে আশ্রয় রাগ বলে।

হিন্দুস্থানী সংগীত পদ্ধতিতে যে কোনও ঠাট ঐ ঠাট হইতে উৎপন্ন একটি বিশেষ রাগের নামে পরিচিত হয়। ঠাটবাচক উক্ত রাগকে আশ্রয় রাগ বলা হয়। যথা—সা রে̲ গ ম প ধ̲ নি সা̇।
এই স্বর-সমন্বয় হইতে ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী প্রভৃতি রাগ উৎপন্ন হইলেও ভৈরব রাগের নামেই ঠাট্‌টী ভৈরব ঠাট বলিয়া পরিচিত। ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন অন্যান্য রাগ গাহিবার সময় উহাতে ভৈরব রাগের ছায়া কিংবা রূপ কম বেশী পরিদৃষ্ট হয়। কাজেই ভৈরব রাগ ঐ সকল রাগের আশ্রয় রাগ।

হিন্দুস্থানী পদ্ধতির ১০টি ঠাট

১। বিলাবল— সা রে গ ম প ধ নি সা̇।

২। কল্যাণ— সা রে গ ম̍ প ধ নি সা̇।

৩। খমাজ— সা রে গ ম প ধ নি̲ সা̇।

৪। ভৈরব— সা রে̲ গ ম প ধ̲ নি সা̇।

৫। পূর্বী— সা রে̲ গ ম̍ প ধ̲ নি সা̇।

৬। মারবা— সা রে̲ গ ম̍ প ধ নি সা̇।

৭। কাফী— সা রে গ̲ ম প ধ নি̲ সা̇।

৮। আসাবরী— সা রে গ̲ ম প ধ̲ নি̲ সা̇।

৯। ভৈরবী— সা রে̲ গ̲ ম প ধ̲ নি̲ সা̇।

১০। তোড়ী— সা রে̲ গ̲ ম̍ প ধ̲ নি সা̇।

বাদী, সম্বাদী, অনুবাদী এবং বিবাদী স্বর

বাদী স্বর—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহের মধ্যে যে স্বরটি সর্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে বাদী স্বর বলে। বাদী স্বরের সাহায্যে রাগ বিশেষের রূপ পরিস্ফুট হয় এবং রাগের মোটামুটি সময় ও নির্ণয় করা যায়। উদাহরণ ঃ—ভৈরব রাগে ধ বাদীস্বর।

সম্বাদী স্বর—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহের মধ্যে যে স্বরটি বাদী স্বরের অপেক্ষা কম কিন্তু অন্যান্য স্বরের অপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হয় তাহাকে সম্বাদী স্বর বলা হয়। উদাহরণ ঃ—ভৈরব রাগে রে সম্বাদী।

অনুবাদী স্বর—কোনও রাগে বাদী এবং সম্বাদী স্বর ভিন্ন অন্য যে সব স্বর ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে অনুবাদী স্বর বলে। উদাহরণ ঃ—ভৈরব রাগে গ, ম, প, নি প্রভৃতি অনুবাদী স্বর।

বিবাদী স্বর—যে স্বর কোনও রাগের নিয়মিত স্বর নহে এবং যাহার প্রয়োগে ঐ রাগের শুদ্ধতা নষ্ট হয় তাহাকে বিবাদী স্বর বলে। বিবাদী স্বর সম্বন্ধে কয়েকটি জ্ঞাতব্য বিষয় আছে।

(১) প্রত্যেক রাগেই একাধিক বিবাদী স্বর আছে। ভৈরব রাগে রে, গ, মং, ধ এবং নি এই পাঁচটি বিবাদী স্বর।

(২) মাধুর্য বৃদ্ধির জন্য কোনও কোনও রাগে কেবল মাত্র একটি বিবাদী স্বর প্রয়োগ করা যাইতে পারে। যথা—ভৈরব রাগে নি।

তান এবং তোড়া—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহের বিভিন্ন রচনাকে দ্রুত গতিতে গাওয়া হইলে উহাকে তান এবং যন্ত্রে দ্রুত গতিতে বাজান হইলে উহাকে তোড়া বলা হয়। তান কিংবা তোড়া বিভিন্ন প্রকার হইয়া থাকে, যথা ঠায়, দুগুণ, চৌগুণ, আটগুণ ইত্যাদি।

ঠায়—গানের কিংবা বাজনার সমান লয়ের তান কিংবা তোড়াকে বরাবর-তান অথবা বরাবর-তোড়া বলা হয়।

দুগুণ—বিলম্বিত দুগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে দুগুণ-তান এবং দুগুণ-তোড়া বলা হয়।

চৌগুণ—বিলম্বিত লয়ের চৌগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে চৌগুণ তান ও চৌগুণ-তোড়া বলা হয়।

আটগুণ—বিলম্বিত লয়ের আটগুণ গতির তান কিংবা তোড়াকে আটগুণ তোড়া বলা হয়।

শুদ্ধ তান ও তোড়া—যে তান ও তোড়ায় স্বর সমূহ আরোহ এবং অবরোহের ক্রম অনুসারে ব্যবহৃত হয় তাহাকে শুদ্ধতান বলে যথা—সা রে গ ম প ধ নি সা̇ ; সা̇ নি ধ প ম গ রে সা।

কূটতান ও তোড়া—যে তান এবং তোড়ায় স্বর সমূহ ক্রমানুসারে হয় না যথা—সা রে গ রে ম প ম গ ইত্যাদি।

মিশ্রতান ও তোড়া—শুদ্ধ ও কূট তান ও তোড়ার মিশ্রণকে মিশ্রতান ও মিশ্রতোড়া বলা হয় যথা—গ ম প নি সা̇ রে̇ সা̇ নি ধ প ম প ম গ ইত্যাদি।

স্বরমালিকা—কোনও রাগে ব্যবহৃত স্বর সমূহকে তাল বদ্ধ করিয়া গাওয়াকে স্বরমালিকা বলা হয়। স্বরমালিকা রাগ বিশেষের স্বরূপ প্রকাশ করে। উহা স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুই ভাগে বিভক্ত।

লক্ষণ গীত—যে গানে কোন রাগ বিশেষের স্বর, জাতি, গাহিবার সময়, বাদী, সম্বাদী প্রভৃতি বর্ণনা করা হয় তাহাকে লক্ষণ গীত বলা হয়।

পকড়—যে অল্প সংখ্যক স্বরসমন্বয় কোন রাগকে চিনিতে সাহায্য করে তাহাকে পকড় বলা হয়, যথা—ম, গ, সা রে সা, ধ নি সা রে নি সা—ভৈরবী।

বক্রস্বর—আরোহ এবং অবরোহের সময় কোনও বিশেষ স্বর পর্যন্ত যাইয়া পূর্ববর্তী স্বরে ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় পরবর্তী স্বরে যাইলে পূর্বোক্ত বিশেষ স্বরকে বক্রস্বর বলে।

যথা :—আরোহে—ম প ধ নি ধ সা̇—এখানে 'নি' বক্রস্বর।

অবরোহে—প ম গ রে গ সা এখানে 'রে' বক্রস্বর।

গমক—কম্পন যুক্ত গুরু গম্ভীর স্বরোচ্চারণকে গমক বলা হয়, যথা—সা S S S, রে S S S ইত্যাদি।

মীড়—আরোহ কিংবা অবরোহে অন্তর্বর্ত্তী স্বরগুলিকে মৃদু মধুর স্পর্শ করিয়া স্বর হইতে স্বরান্তরে যাওয়াকে মীড় বলা হয়, যথা—র্সা ধ নি প, র্সা প ধ ম ইত্যাদি।

সুত—সুত একপ্রকার মীড়, গানে এবং সেতারে যে প্রকারের মীড়ের প্রয়োগ করা হয় সারেঙ্গী, সরোদ প্রভৃতি যন্ত্রে সেইরূপ সুতের প্রয়োগ করা হয়।

কণ—কোনও প্রধান স্বর উচ্চারণ করিবার সময় পূর্ব্ব এবং পরবর্তী স্বরগুলিকে ঈষৎ স্পর্শ করা হইলে ঐরূপ স্বরকে কণ, ভূষিকা কিংবা স্পর্শস্বর

নি ম
(Grace note) বলা হয়, যথা— ধ, ধ ইত্যাদি।

এখানে নি এবং ম স্পর্শস্বর।

পুকার—বিভিন্ন সপ্তকের অন্তর্গত এক কিংবা একাধিক স্বরোচ্চারণকে পুকার বলে, যথা—র্সা সা, র্রে র্রে রে রে, র্ম গ রে সা ম গ রে সা ইত্যাদি।

আলাপ—আলাপ এক প্রকার গান, উহা আকারের সাহায্যে কিংবা ন, না, ন, রী, রে, ন, তোঁ, নোঁ, নারে, নেনেরী, তনানা প্রভৃতি শব্দের সাহায্যে গাওয়া হয়। আলাপ রাগ বিশেষের স্বরূপ পরিপূর্ণ ভাবে প্রকাশ করে। আলাপ চার ভাগে বিভক্ত—স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ। প্রাচীনকালে উপরোক্ত ভিন্ন ভিন্ন ভাগগুলিকে ধাতু বলা হইত।

মূর্চ্ছনা—মন্দ্র, মধ্য অথবা তার স্থানে সপ্তকের অন্তর্গত যে কোনও স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমানুসারে পরবর্তী স্থানের অনুরূপ স্বরের সাহায্যে আরোহণ অবরোহণ দেখান হইলে উহাকে মূর্চ্ছনা বলা হয়, যথাঃ—(১) সা রে গ ম প ধ নি র্সা | র্সা নি ধ প ম গ রে সা।
(২) ন়ি সা রে গ ম প ধ নি | নি ধ প ম গ রে সা ন়ি।

গ্রাম—সপ্তকের প্রত্যেকটি স্বরকেই গ্রাম বলা যাইতে পারে কিন্তু তন্মধ্যে তিনটি গ্রামই প্রধান যথা :—ষড়জ্ গ্রাম, গান্ধার গ্রাম ও মধ্যম গ্রাম। ইহা মূর্চ্ছনার ভিত্তি অর্থাৎ আশ্রয় স্বরূপ।

আশ—দুই বা ততোধিক স্বর এক সঙ্গে উচ্চারণ করা হইলে তাহাকে আশ বলে যথা :—মপ ধ্‌প মপ ; রেগম গমপ, মপধ্‌নি পধ্‌নিসা ইত্যাদি।

গিটকারী—গিটকারী একটি হিন্দী শব্দ। গিট অর্থাৎ শীঘ্র। স্বর সমূহকে আশ সহকারে দ্রুত গতিতে গাইলে কিংবা বাজাইলে উহাকে গিট্‌কারী বলে। গিট্‌কারী দুই প্রকার—সাধারণ গিট্‌কারী এবং সগমক গিট্‌কারী।

কম্পন—একই স্বর পুনঃ পুনঃ কম্পনের সহিত উচ্চারণ করিলে উহাকে কম্পন বলে যথা :—সাসাসা, রেরেরে ইত্যাদি।

বাঁট—বাঁট বণ্টন শব্দের অপভ্রংশ। এখানে শব্দটি 'গানের ভাগ' এই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। গানের কথাগুলিকে রাগের শুদ্ধতা রক্ষা করিয়া দ্বিগুণ, ত্রিগুণ, চৌগুণ ইত্যাদি বিভিন্ন ছন্দে গাওয়াকে বাঁট বলে।

ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী

প্রাচীন কালে প্রধানতঃ ছয় রাগ ও ছত্রিশ রাগিণী মানিয়া লইয়া অবশিষ্ট রাগগুলিকে উহাদের পুত্র কন্যা বলিয়া ধরা হইত। আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্রে রাগিণী বলিয়া কোনও কথা নাই। বর্তমান মতে ভৈরব এবং ভৈরবী উভয়ই 'রাগ' বলিয়া বিবেচিত হয়।

ছয় রাগ :—

"ভৈরবো মালকৌশশ্চ হিন্দোলো দীপকস্তথা।
শ্রীরাগো মেঘরাগশ্চ ষড়েতে পুরুষাঃ স্মৃতাঃ ॥"

অর্থাৎ "ভৈরব, মালকৌশ. হিন্দোল, দীপক, শ্রী ও মেঘ এই ছয়টি রাগ পুরুষ।

ছত্রিশ রাগিণী :—উপরোক্ত প্রত্যেক রাগের ছয়টি করিয়া পত্নী ধরিয়া মোট নিম্নলিখিত ছত্রিশটি রাগিণী মানা হইত যথা :—

রাগ	রাগিণী
১। ভৈরব	ভৈরবী, রামকলী, বঙ্গালী, কলিঙ্গা, মঙ্গলিকা ও সিন্ধু।
২। মালকৌশ	কৌশিকী, টঙ্কা, মুদ্রাকী, বাগীশ্বরী, নাটিকা ও গুর্জ্জরী।
৩। হিন্দোল	পুরিয়া, জয়ন্তী, দেবগিরি, বেলাবলী, ককুভা ও দেশকার।
৪। দীপক অথবা পঞ্চম	ললিতা, শোভনী, কামোদী, কেদারী, কল্যাণী ও ভূপালী।
৫। শ্রী	ধনাশ্রী, ত্রিবর্ণী, মালবী, গৌরী, জয়তশ্রী ও মালবশ্রী।
৬। মেঘ	মল্লারী, সৌরটী, দেশাক্ষী, সারঙ্গী, মধুমাধবী ও বড়হংসিকা।

প্রাচীনকালে সাধারণতঃ বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন রাগ গাওয়া হইত যথা :—

গ্রীষ্মে—দীপক	হেমন্তে—মালকৌশ
বর্ষায়—মেঘ	শীতে—শ্রী
শরতে—ভৈরব	বসন্তে—হিণ্ডোল।

প্রত্যেক রাগ সম্বন্ধেই নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জ্ঞাতব্য—ঠাট, আরোহ, অবরোহ, পকড়, জাতি, কি কি স্বর লাগে, বাদী, সংবাদী, সময়, পূর্বরাগ অথবা উত্তর রাগ, বৈশিষ্ট্য, আলাপের প্রণালী।

রাগ ইমন

১। ইমন রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ—সা রে গ, ম॑ প, ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ, প, ম॑ গ, রে সা।

৩। পকড়—ন়ি রে গ রে, সা, প ম॑ গ, রে, সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

৫। এই রাগে ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—গ।

৭। সম্বাদী—নি।

৮। সময়—রাত্রির প্রথম প্রহর।

৯। ইহা পূর্বরাগ।

১০। আমীর খুসরু নামে একজন প্রসিদ্ধ গায়ক ইমন রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহার করিয়া উহাকে ইমন কল্যাণ নামে অভিহিত করিয়াছেন।

১১। আলাপ—

(ক) নি রে গ রে গ, ম গ, প ম গ, প রে, নি রে গ রে, নি রে সা।

(খ) প গ, প ধ প সা, নি রে সা, নি রে গ রে সা, নি রে গ
ম প ম গ রে নি রে সা।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ—পূর্বরাগ অথবা পূর্বাঙ্গ-বাদী রাগ এবং উত্তর রাগ অথবা উত্তরাঙ্গ-বাদী রাগ—যদি কোন রাগের বাদী স্বরটি সপ্তকের পূর্বার্দ্ধে অর্থাৎ 'সা রে গ ম প' এই স্বরগুলির মধ্যে হয় তবে তাহাকে পূর্বরাগ এবং যদি উহা সপ্তকের উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ ম প ধ নি সা' র মধ্যে হয় তবে তাহাকে উত্তর রাগ বলা হয়।

রাগ বিলাবল

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি, সা।
অবরোহ—সা নি ধ, প ম গ, রে সা।

৩। পকড়—গ রে, গ প, ধ, নি সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

৫। এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ।

৬। বাদী—ধ।

৭। সম্বাদী—গ।

৮। সময়—প্রাতঃকাল

৯। ইহা উত্তর রাগ।

১০। (ক) কল্যাণ রাগের সহিত সাদৃশ্য আছে বলিয়া ইহাকে প্রাতঃকালীন কল্যাণ রাগ বলা হয়।

(খ) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্র।

(গ) বিলাবল রাগে আরোহে ম বর্জন করিয়া অবরোহে নি'র ঈষৎ প্রয়োগে আহ্লৈয়া বিলাবল রাগের সৃষ্টি হইয়াছে।

১১। (ক) আলাপ—সা, গ, রে, সা, নি ধ সা, গ, ম প ম গ, ম রে সা।

(খ) প প, ধ, নি সা, সা রে সা, গ ম রে সা, সা রে গ ম প গ ম রে সা।

রাগ আহ্লৈয়াবিলাবল

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা, রে, গ রে, গ প, ধ, নি ধ, নি সা।
অবরোহ—সা নি ধ, প, ধ নি ধ প, ম গ, ম রে, সা।

৩। পকড়—ধ নি ধ প, ধ গ ম রে সা।

৪। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

৫। অবরোহে নি কোমল, ইহা ব্যতীত এই রাগের সকল স্বরই শুদ্ধ।

৬। বাদী—ধ।

৭। সম্বাদী—গ।

৮। সময়—প্রাতঃকালের প্রথম প্রহর।

৯। উত্তর রাগ।

১০। (ক) এই রাগের আরোহে মধ্যম বর্জিত এবং অবরোহে নি ব্যবহার করা হয়।

(খ) এই রাগে আরোহে নি এবং অবরোহে গ বক্র।

১১। আলাপ—

(ক) গ প ধ নি ধ, প, ধ ম গ, ম রে, গ ম প, ম গ, ম রে সা।

(খ) প প, ধ নি ধ, সা, সা রে সা, প প ধ নি সা রে গ রে সা।

রাগ খমাজ

১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা, গ ম, প, ধ নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ প, ম গ, রে সা।

৩। পকড়—নি ধ, ম প, ধ, ম গ।

৪। জাতি—ষাড়ব—সম্পূর্ণ।

৫। ইহাতে অবরোহে নি কোমল ইহা ভিন্ন অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—গ

৭। সম্বাদী—নি

৮। সময়—রাত্রি দ্বিতীয় প্রহর।

৯। পূর্বরাগ

১০। (ক) ইহা একটি জনপ্রিয় রাগ। এই রাগে বেশীর ভাগ খেয়াল এবং ঠুংরীই গাওয়া হইয়া থাকে, ইহাতে ধ্রুবপদের গান খুবই কম।

১১। আলাপ—

(ক) নি সা গ ম প গ, ম, নি ধ, ম প ধ, ম গ, প, ম গ রে সা।

(খ) গ ম ধ নি সা, নি সা, নি নি সা রে সা, নি ধ, নি সা,

গ ম গ রে সা নি সা।

রাগ ভৈরব

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে গ ম, প ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ, প ম গ, রে, সা।

৩। পকড়—সা, গ, ম প, ধ, প, ম গ ম রে, সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ

৫। এই রাগে রে এবং ধ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—ধ

৭। সম্বাদী—রে

৮। সময়—উষাকাল।

৯। উত্তর রাগ।

১০। (ক) ভৈরব একটি অতি প্রাচীন এবং গম্ভীর প্রকৃতির রাগ। এই রাগে বেশীর ভাগ আলাপ মন্দ্র এবং মধ্য সপ্তকে হইয়া থাকে।

(খ) এই রাগের রে এবং ধ অতি কোমল এবং ঈষৎ আন্দোলিত।

(গ) এই রাগে নি বিবাদী স্বর হইলেও কেহ কেহ সৌন্দর্য সৃষ্টির জন্য ইহার ব্যবহার করিয়া থাকেন।

১১। আলাপ—

(ক) সা, রে, রে, সা, সা ধ, নি ধ, প, ম প ধ, নি সা, গ রে, ম গ রে, রে সা।

(খ) প প, ধ, নি র্সা, নি র্সা, র্সা ধ, নি র্সা রে্, র্সা, র্সা গ্ ম্ প্ ম্ গ্ ম্ রে্, রে্, র্সা।

রাগ পূর্বী

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা, রে গ, ম প, ধ, নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ প, ম, গ, রে সা।

৩। পকড়—নি, সা রে গ, ম গ, ম, গ, রে গ, রে সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ

৫। এই রাগে রে, ধ কোমল, উভয় মধ্যম এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—গ

৭। সম্বাদী—নি

৮। সময়—দিবা অন্তিম প্রহর।

৯। পূর্ব রাগ

১০। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগ গাহিবার সময় দিবসের অন্তিম প্রহর বলিয়া ধার্য্য করা হইলেও দিন রাত্রির মিলনক্ষণ ইহা গাহিবার পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা অনুকূল। এই জন্য ইহাকে সন্ধি-প্রকাশ রাগও বলা হয়।

১২। আলাপ—

(ক) নি নি সা রে গ, ম গ, রে গ, ম প ধ প, ম গ, নি নি ধ প, ম গ, ম গ, রে গ রে সা।

(খ) ম গ, ম ধ ম ধ, সা, নি রে সা, নি রে গ, ম গ ম গ, রে গ রে সা।

রাগ মারোয়া

১। এই রাগ মারোয়া ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ—সা ঋে, গ ম ধ, নি ধ র্সা।

অবরোহ—র্সা নি ধ, ম গ, ঋে সা।

৩। পকড়—ধ ম গ ঋে, গ ম গ ঋে সা।

৪। জাতি—ষাড়ব

৫। এই রাগে ঋে কোমল, ম তীব্র এবং অবশিষ্ট স্বর শুদ্ধ। এই রাগে 'প' বর্জ্জিত।

৬। বাদী—ঋে

৭। সম্বাদী—ধ

৮। সময়—সূর্যাস্তকাল।

৯। পূর্ব রাগ

১০। ঋে গ এবং ধ এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। এই রাগ সন্ধি প্রকাশ রাগ। ইহাকে পরমেল প্রবেশক রাগও বলা হয় কারণ এই রাগ গাহিবার পর কল্যাণ মেল হইতে উৎপন্ন ইমন, ভূপালী, কেদার প্রভৃতি রাগ গাওয়া হয়।

১১। আলাপ—

(ক) সা, ন়ি ঋে সা, ন়ি ঋে ন়ি ধ়, ম় ধ়, সা, ঋে, গ রে, ম গ ঋে,

ধ ম গ ঋে, ন়ি, ঋে সা।

(খ) ম গ, ম ধ ম, সা, নি রে সা, নি রে গ ম গ রে সা,

নি রে নি ধ, ম ধ ম গ, ম ধ সা।

রাগ কাফী

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ—সা রে গ, ম প, ধ নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ প, ম গ, রে সা।

৩। পকড়—সা সা রে রে গ গ ম ম, প।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

৫। গ, নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—প

৭। সম্বাদী— সা

৮। সময়— রাত্রির ২য় প্রহর। কেহ কেহ ইহাকে সর্বকালীন রাগও বলিয়া থাকেন।

৯। পূর্ব রাগ।

১০। এই রাগে তীব্র গ এবং নি ও প্রয়োগ করা হয়। এই রাগের বৈশিষ্ট্য সা গ প এই তিন স্বরের উপর নির্ভর করে।

১১। আলাপ—

(ক) সা রে গ, রে, সা, নি ধ প, সা, রে গ রে, ম গ রে সা,

রে প, ম প ধ প, ম প গ রে, নি ধ প, ধ গ রে সা।

(খ) ম প ধ নি সাঁ, নি সাঁ গঁ রেঁ সাঁ, মঁ গঁ রেঁ সাঁ, গঁ গঁ রেঁ সাঁ, রেঁ রেঁ সাঁ নি, সাঁ সাঁ নি ধ, নি নি ধ প, ধ ধ প ম, প প ম গ, ম ম গ রে, গ গ রে সা, সা রে, রে গ, গ ম, ম প, প ধ, ধ নি নি সাঁ।

রাগ আসাবরী

১। এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ—সা, রে ম প, ধ সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ, প, ম গ রে সা।

৩। পকড়—রে ম প, নি ধ প।

৪। জাতি—ঔড়ব—সম্পূর্ণ

৫। গ, ধ, নি কোমল, বাকি স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—ধ

৭। সম্বাদী—গ

৮। সময়—প্রাতঃকাল।

৯। উত্তর রাগ।

১০। এই রাগের বৈশিষ্ট্য গ প ধ এই তিন স্বরের উপর নির্ভর করে। কেহ কেহ কোমল রে ব্যবহার করিয়া এই রাগ গাহিয়া থাকেন কিন্তু শুদ্ধ রে যুক্ত আসাবরী রাগই অধিক প্রচলিত।

১১। আলাপ—

(ক) সা, সা রে গ রে সা, রে ম গ রে সা, রে নি ধ প ম প ধ সা,
রে ম প নি ধ প, ধ ম প ধ ম প গ, রে সা, রে ধ সা।

(খ) ম প ধ, ধ, সা, সা রে গ রে সা, রে ম প ম গ রে সা,
রে ধ সা, রে নি ধ প, ম প ধ, সা।

রাগ ভৈরবী

১। এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ—সা রে গ ম, প ধ, নি সা।

অবরোহ—সা নি ধ, প ম, গ রে সা।

৩। পকড়—গ, সা রে সা ধ নি, সা রে নি সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ

৫। এই রাগে রে গ ধ নি কোমল এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী—ম

৭। সম্বাদী—সা

৮। সময়—প্রাতঃকাল।

৯। উত্তর রাগ।

১০। কেহ কেহ এই রাগকে সর্বকালীন রাগ বলিয়া মানিয়া থাকেন। এই রাগ মধুর ও জনপ্রিয়। কেহ কেহ এই রাগে রে এবং ম রাগের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করিয়া থাকেন। সা, গ, ম, প এবং ধ এই স্বর সমূহের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

১১। আলাপ—

(ক) সা রে সা, নি সা ধ প, ম প ধ নি সা, গ, সা রে সা, ম, প ম, ধ প ম, গ ম, সা রে গ ম, ম গ, সা রে নি সা, ধ প ম গ, সা রে নি সা, ধ নি সা।

(খ) ধ ম, ধ নি সাঁ, নি সাঁ, গঁ, সাঁ রেঁ নি সাঁ ধ নি সাঁ, মঁ মঁ গঁ গঁ রেঁ রেঁ সাঁ, নি সাঁ রেঁ সাঁ, নি সাঁ নি ধ প ম গ ম ধ নি সাঁ।

রাগ তোড়ী

১। এই রাগ তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

২। আরোহ— সা রে গ, মঁ প, ধ, নি সাঁ।

অবরোহ— সাঁ নি ধ প, মঁ গ, রে সা।

৩। পকড়— ধ নি সা রে গ, রে সা, মঁ গ রে সা।

৪। জাতি—সম্পূর্ণ।

৫। এই রাগে রে গ এবং ধ কোমল, মঁ তীব্র এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।

৬। বাদী— ধ

৭। সম্বাদী— গ

৮। সময়— প্রাতঃকাল।

৯। উত্তর রাগ।

১০। বৈশিষ্ট্য— এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর, এই রাগে অবরোহে 'রে' এর উপর কিঞ্চিৎ বিশ্রাম করিয়া 'সা' তে যাইলে রাগের রূপ সুস্পষ্ট হয়। গ, প, নি এই তিন স্বরের উপর এই রাগের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে।

১১। আলাপ—

(ক) সা, নি, সা রে গ, রে গ, মঁ গ, ধ মঁ গ রে গ রে সা, সা রে গ মঁ প, মঁ ধ নি ধ, প, মঁ প ধ নি নি ধ প গ, ধ গ, প মঁ গ, রে গ, রে সা, নি ধ প, মঁ প ধ, মঁ ধ, ধ নি সা রে গ রে সা।

(খ) মঁ গ, মঁ ধ, নি, সাঁ, ধ নি সাঁ রেঁ গঁ রেঁ সাঁ, মঁ গঁ, পঁ মঁ গঁ, রেঁ গঁ রেঁ সাঁ নি ধ প মঁ ধ সা।

—:০:—

তৃতীয় অধ্যায়

তাল

তাল— সঙ্গীতের (গীত, বাদ্য এবং নৃত্যের) সময়ের পরিমাপকে তাল বলা হয়। সঙ্গীতকে বিভিন্ন প্রকারের সুললিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া মনোমুগ্ধকর করিবার উদ্দেশ্যে চৌতাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকারের তাল সৃষ্ট হইয়াছে। অসীমকালকে সূর্যোদয়—সূর্য্যাস্ত এবং বিশেষ করিয়া ঘড়ির সাহায্যে সীমাবদ্ধ করিয়া আমরা উহাকে ব্যবহারিক জগতে এবং তালবদ্ধ করিয়া সঙ্গীতে প্রয়োগ করিয়া থাকি।

মাত্রা— তালের ক্ষুদ্রতম অংশ অর্থাৎ তাল মাপিবার একক সংখ্যাকে (Unit of measurement) মাত্রা বলে। যথা :—১২টি মাত্রার সমন্বয়ে চৌতাল এবং ১০টি মাত্রার সমন্বয়ে ঝাঁপতাল সৃষ্ট হইয়াছে।

তাল-বিভাগ—প্রত্যেক তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলিকে ছন্দের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে। ঐ ভাগগুলিকে তাল-বিভাগ (Division of Tal) বলা হয়। ছন্দানুযায়ী বিভিন্ন তালে মাত্রা সংখ্যার বৈষম্য লক্ষিত হয়। যথা :—চৌতালে ২ মাত্রা করিয়া ৬টি বিভাগ, ত্রিতালে ৪ মাত্রা করিয়া ৪টি বিভাগ এবং ঝাঁপতালে যথাক্রমে ২, ৩, ২, ৩, মাত্রা হিসাবে ৪টি বিভাগ আছে।

লয়— তালের গতিকে লয় বলে। কোন ও তালের অন্তর্গত মাত্রাগুলির পরস্পরের ব্যবধান কিংবা গতিবেগ সমান হইবে।

লয় প্রধাণতঃ তিন প্রকার :—

১। বিলম্বিত লয়—খুব ধীর গতির তালকে বিলম্বিত লয়ের তাল বলা হয়। যথা :—তিলওয়াড়া, ঝুমরা ইত্যাদি।

২। মধ্যলয়—বিলম্বিত লয় হইতে দ্রুততর গতির তালকে মধ্যলয়ের তাল বলা হয়। যথা ঃ—মধ্যলয়ের ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

৩। দ্রুতলয়—মধ্যলয় হইতে দ্রুততর গতির তালকে দ্রুতলয়ের তাল বলা হয়। যথা ঃ—দ্রুতগতির ত্রিতাল, ঝাঁপতাল ইত্যাদি।

বোল—তবলার 'ভাষা'কে বোল বলা হয়। কিন্তু এখানে ভাষার অর্থ একটু ভিন্ন প্রকারের। যে অর্থযুক্ত শব্দের সাহায্যে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে তাহাকেই 'ভাষা' বলা হয়। কিন্তু যে সাঙ্কেতিক শব্দের সাহায্যে তবলার বিভিন্ন তাল বোঝান হইয়া থাকে উহাকে তবলার বোল, বাণী অথবা ঠেকা বলা হয়। পাখোয়াজে উহাকে বলা হয় থাপিয়া।

সম— যে মাত্রা হইতে কোন ও তাল আরম্ভ করা হয় তাহাকে 'সম' বলা হয়। 'সম' অথবা প্রথম তালের চিহ্ন '×'। গান যে কোন ও মাত্রা হইতে আরম্ভ করা যাইতে পারে কিন্তু সব সময়েই 'সম' এ শেষ করিতে হইবে। কিন্তু তাল সব সময়ই প্রথম মাত্রা হইতে আরম্ভ করিতে হইবে এবং প্রথম মাত্রায় অর্থাৎ 'সম' এ শেষ করিতে হইবে।

তালি ও খালি—তাল-বিভাগ দেখাইবার সময় দুই হাতের তালুর আঘাতে যে শব্দ করা হয় তাহাকে 'তালি' এবং উহার বিরতি বোধক অনাঘাতকে খালি অথবা ফাঁক বলা হয়। তালের প্রত্যেক বিভাগের প্রথম মাত্রায় তালি অথবা খালি হইবে। কোন ও তাল সম্বন্ধে আলোচনা কালে উহার লয়, মাত্রা, বিভাগ, বোল, তাল চিহ্ন প্রভৃতিই প্রধানতঃ জ্ঞাতব্য বিষয়। উদাহরণ স্বরূপ নিম্নলিখিত তালটিকে আলোচনা করা যাক্।

ত্রিতাল (মধ্য কিংবা দ্রুতলয়ের)

১ ২ ৩ ৪	৫ ৬ ৭ ৮	৯ ১০ ১১ ১২	১৩ ১৪ ১৫ ১৬
ধা ধীন্ ধীন্ ধা	ধা ধীন্ ধীন্ ধা	না তীন্ তীন্ তা	তীট ধীন্ ধীন্ ধা
×	২	o	৩

উপরোক্ত ত্রিতাল মধ্য কিংবা দ্রুতলয়ের হইতে পারে। উহাতে ১৬টি মাত্রা আছে। মাত্রাগুলি ৪ মাত্রা হিসাবে ৪ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে এবং 'ধা ধীন্ ধীন্ ধা' ইত্যাদি সাঙ্কেতিক শব্দ অথবা বোলের সাহায্যে ত্রিতালের স্বরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে ও '×' '২' '৩' চিহ্ন দ্বারা যথাক্রমে 'সম' অর্থাৎ তালের ১ম মাত্রার উপর প্রথম, ৫ম মাত্রায় দ্বিতীয় এবং ১৩শ মাত্রায় তৃতীয় মোট এই তিনটি তালি এবং 'o' চিহ্ন দ্বারা ৯ম মাত্রায় খালি অথবা ফাঁক সূচিত হইয়াছে।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির কতিপয় তাল নিম্নে প্রদত্ত হইল।

দাদ্‌রা (মধ্য কিংবা দ্রুত)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬
ধীন্ ধীন্ ধা	ধা তী না
×	o

তীব্রা অথবা তেওড়া (মধ্য কিংবা দ্রুত)

	১ ২ ৩	৪ ৫	৬ ৭
থাপিয়া—	ধা দীন্ তা	তিট কত	গদি গন
	×	২	৩

ঝবতাল অথবা ঝাঁপতাল (মধ্য কিংবা দ্রুত)

১ ২	৩ ৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০
ধী না	ধী ধী না	তী না	ধী ধী না
×	২	o	৩

সূলতাল (বিলম্বিত)

	১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০
থাপিয়া—	ধা ধা	দীন্ তা	কিট ধা	তিট কত	গদি গন
	×	o	২	৩	o

চৌতাল (বিলম্বিত)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
ধা ধা	দীন্ তা	কিট ধা	দীন্ তা	তিট কত	গদি গন
×	o	২	o	৩	৪

একতাল (বিলম্বিত)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
ধীন্ ধীন্	ধাগি তৃক	তু না	কৎ তা	ধাগি তৃক	ধীন্ না
×	o	২	o	৩	৪

একতাল (দ্রুত)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮	৯ ১০	১১ ১২
ধিন্ ধিন্	ধা ধা	তুন্ না	কৎ তা	ধা তৃক	ধিন্ না
×	o	২	o	৩	৪

আড়াচৌতাল (বিলম্বিত)

১ ২	৩ ৪	৫ ৬	৭ ৮
ধীন্ তিরকিট	ধীন্ না	তু না	ক ত্তা
×	২	o	৩

৯ ১০	১১ ১২	১৩ ১৪
তিরকিট ধীন্	না ধী	ধী না
o	৪	o

ঝুমরা (বিলম্বিত)

১ ২ ৩	৪ ৫ ৬ ৭	৮ ৯ ১০	১১ ১২ ১৩ ১৪
ধীন্ Sধা তৃক	ধীন্ ধীন্ ধাগি তৃক	তীন্ Sতা তৃক	ধীন্ ধীন্ ধাগি তৃক
×	২	o	৩

ধমার (বিলম্বিত)

১ ২ ৩ ৪ ৫	৬ ৭	৮ ৯ ১০	১১ ১২ ১৩ ১৪
ক ধি ট ধি ট	ধা S	গ তি ট	তি ট তা S
×	২	o	৩

দীপচন্দী (বিলম্বিত)

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪
ধা	ধীন্	S	ধা	গ	তীন্	S	তা	তীন্	S	ধা	গ	ধীন্	S
×			২				o			৩			

তিলওয়াড়া

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২
ধা	তৃক	ধীন্	Sধীন্	ধা	ধা	তীন্	তীন্	তা	তৃক	ধীন্	Sধীন্
×				২				o			

১৩	১৪	১৫	১৬
ধা	ধা	ধীন্	ধীন্
৩			

কীর্ত্তনে ব্যবহৃত কতিপয় তাল :—

বড় দশকোশী তাল। লওয়া ২৮ মাত্রা

\+
(গুরু) ঝাঁখি তাখি ঝাঁখি ঝাঁখি তাখি ঝাঁখি ঝাঁখি ঝাঁখি
২
(১) ঝাঁখি তাখি ঝাঁখি ঝাঁখি তাখি ঝাঁতা ঝাঁঝাঁ ঝাঁঝা
৩
ঝাঁতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু
৪
ঝাঁখি তা তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি
\+
(লঘু) তা — তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি
২
তা — তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি
৩
তাতা তাতা খিখি গুরুগুরুগুরুগুরু
৪
তা — তিন্ দা তিন দা খিখি তাখি

মধ্যম দশকোশী তাল ১৪ মাত্রা

লওয়া।

\+ ২
(গুরু) ঘেনা গেঘে নাগে ঘেনা ঘেনা গেঘে নাগে ঘেনা
৩ ৪
(২) ঝাঁঘি গুরুগুরুগুরুগুরু জাখি না তেটে খিটি।
\+ ২
(লঘু) তা—গুরুগুরু তাখি তেটে খিটি তা—গুরুগুরু তাখি
তেটে খিটি
৩ ৪
তা গুরুগুরুগুরুগুরু তাৎ তা খিখি তাখি॥

ছোট দশকোশী তাল ৭ মাত্রা।

লওয়া।

\+ ২
(গুরু) ৩। ঝাঁ-ঝিঁ নাক ঝিনি ঝাঁ-ঝিঁ নাক ঝিনি
৩ ৪
ঝাঁ গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি।
\+ ২
(লঘু) তা-থি নাক থিনি তা-থি নাক থিনি
৩ ৪
তা গুরুগুরু তাৎ-তা খিখি॥

তেওট তাল ১৪ মাত্রা।

লওয়া।

\+
(গুরু) ৪। ঝাঁ খি ঝাঁ খি — গুরুগুরুগুরুগুরু
২ ৩
ঝাঁ খি ঝিন্ নাক দিগি দাঘি নেতা খেটা।
\+
(লঘু) তা — তা — — গুরুগুরুগুরুগুরু
২ ৩
তাৎ তেটে তেটে খিটি নাক দাধে ইদা ধেই॥

তেওটি তাল ৭ মাত্রা।

লওয়া।

\+ ২ ৩
(গুরু) ৫। ঝাঁ ঝাঁ — দিগি দাঘি নেতা খেটা
\+ ২ ৩
(লঘু) তা তা — তেটে তাখি নেদা গেদা॥

বড় লোফা তাল ১২ মাত্রা।

লওয়া।

	+			২		°			
৬।	দিদ্	দা	ঝি্ব	নাক	তেটে	তেটে	খে	টা	ঝাঁ
		৪							
		তা	—	গুরুগুরুগুরুগুরু ॥					

লোফা তাল ৬ মাত্রা।

লওয়া।

		+			°		
(গুরু)	৭।	জা	ক	জা	জা	ঘি	নি
		+			°		
(লঘু)		তা	ক	তা	তা	খি	টি

ছোট লোফা ৬ মাত্রা।

লওয়া।

	+			°		
৮।	ধি	ইন্	তা	—	ধি	ধা ॥

দোঠুকি তাল ১৪ মাত্রা।

লওয়া।

		+			২			
(গুরু)	৯।	ধা	ধি	ধা	ধা	—	ধা	—
		°						
		ধা	ধি	ধা	ধা	—	গুরুগুরু	গুরুগুরু।
	+			২				
(লঘু)	ধা	ধি	ধা	ধা	—	তে	টে	
		°			°			
		তা	খি	টি	তা	—	গুরুগুরু	গুরুগুরু ॥

ছোট দোঠুকি তাল ১৪ মাত্রা।

লওয়া।

	+			২			
১০।	তা	গুরু	গুরু	তা	আৎ	তা	—
	°			°			
	—	—	—	দা	আদ্	ধে	ই ॥

দাসপ্যারী তাল ৮ মাত্রা।

লওয়া।

+ ২
১১। ঝিনি তা তেটে তাখি গুরুগুরু দাঘি নেতা গেদা ॥

ছোট দাসপ্যারী ৪ মাত্রা।

লওয়া।

+ ২
১২। দাখি নেতা নাক ধিনি ॥

একতালি তাল ১৪ মাত্রা।

লওয়া।

+
১৩। ঝা — তি নি তা খি টি
২
তা — ঝি নি জা ঝি নি ॥

ছোট একতালি ১৪ মাত্রা।

লওয়া।

+ ২
১৪। ধি ইৎ তা — — খি — — — ধা — ধি ধা — ॥

তেওরা তাল ৭ মাত্রা।

লওয়া।

+ ২ ৩
১৫। (গুরু) ঝাঁ ঝিন্ না গুরুগুরু ঝিনা ঝিন্ না।
+ ২ ৩
(লঘু) তা তিন্ না তেটে তেটে খিটি তাক ॥

ঝাঁপতাল ১০ মাত্রা।

লওয়া।

+ ২ ০ ৩
১৬। ধে টে ধা গে না তে টে তা খি টি ॥

ধরা তাল ১৬ মাত্রা

লওয়া

১৭। (গুরু) ঝা খি — গুরুগুরুগুরুগুরু ঝাঁ — ঝাঁ —

ঝি নি তা খি তা — খি খি।

(লঘু) ঝাঁ খি — গুরুগুরুগুরুগুরু তা — তা –

খি খি তা খি তা — খি খি॥

বড় রূপক তাল ১২ মাত্রা।

(লওয়া)

১৮। (গুরু) ঝাঁ গুরুগুরুগুরুগুরু ঝাঁ ঝাঁ

ঝেন্ দা ঝাঁ ঝাঁ তা ঝাঁ ঝাঁ ঝাঁ।

(লঘু) ঝাঁঝাঁ তাতা—গুরুগুরুগুরুগুরু

তা — তিন্ দা তিন্ দা খিখি তাখি॥

ছোট রূপক ৬ মাত্রা।

লওয়া।

১৯। (গুরু) ঝাঁ গুরুগুরু জাঘি নাক তিনি তিনি।

(লঘু) তা গুরুগুরু তাৎ তা খি খি॥

চঞ্চুপুট তাল ৮ মাত্রা।

২০। গেদ্দা গিঘি নেদা ঘি গেদ্দা গিঘি নেতা খি॥

চতুর্থ অধ্যায়

ঠাটোৎপত্তি প্রকার

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে দেখা যায় যদি সপ্তকে রাগোপযোগী ১২টী স্বর মানা হয়, তাহা হইলে সপ্তক হইতে ৭২টি মেল বা ঠাট উৎপন্ন হইতে পারে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের সঙ্গীতজ্ঞ পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী তাঁহার রচিত চতুর্দ্দণ্ডি প্রকাশিকা গ্রন্থে সর্ব্বপ্রথম এই সিদ্ধান্ত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ব্যঙ্কটমখী নিম্নোক্ত প্রকারে ৭২টি ঠাট রচনা করিয়াছেন।

সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর এই প্রকার ঃ—

সা রে̱ রে গ̱ গ ম ম̍ প ধ̱ ধ নি̱ নি

ঠাট রচনার জন্য এই ১২টি স্বর হইতে প্রত্যেকবার ক্রমানুসারে ৭টি স্বর প্রয়োগ করিতে হইবে। উপরোক্ত ১২ স্বরের মধ্যে 'ম̍' মধ্যমকে সাময়িক ভাবে বাদ দিয়া উহার স্থলে 'সা̇' প্রয়োগ করিলে ঐ পংক্তি এইরূপ দাঁড়ায় ঃ— সা রে̱ রে গ̱ গ ম প ধ̱ ধ নি̱ নি সা̇।

এখন এই ১২ স্বরকে মধ্যম পর্য্যন্ত সমভাগে বিভক্ত করিয়া দেখিতে হইবে প্রতি অৰ্দ্ধভাগ হইতে কয়টি চতুঃস্বরী মেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে। প্রত্যেক পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর 'সা' এবং অন্তিম স্বর 'ম' এবং প্রত্যেক উত্তর মেলার্দ্ধের প্রথম স্বর 'প' এবং অন্তিম স্বর 'সা̇' হইবে।

পূর্ব্ব সপ্তকার্দ্ধে অর্থাৎ 'সা রে̱ রে গ̱ গ ম' এই স্বর সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৬টি পূর্ব্বমেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে।

১। সা রে রে ম

২। সা রে গ ম

৩। সা রে গ ম

৪। সা রে গ ম

৫। সা রে গ ম

৬। সা গ গ ম

এই প্রকার সপ্তকের উত্তরার্দ্ধে অর্থাৎ 'প ধ ধ নি নি সা' এই স্বর সমূহ হইতে নিম্নলিখিত ৬টি উত্তর মেলার্দ্ধ উৎপন্ন হইতে পারে।

১। প ধ ধ সা

২। প ধ নি সা

৩। প ধ নি সা

৪। প ধ নি সা

৫। প ধ নি সা

৬। প নি নি সা

এখন সম্পূর্ণ মেল রচনা করিতে হইলে উপরোক্ত প্রত্যেকটি পূর্ব্ব মেলার্দ্ধের সহিত ছয়টি করিয়া উত্তর মেলার্দ্ধ যোগ দিতে হইবে যথা :—

১। সা রে রে ম, প ধ ধ সা।

২। সা রে রে ম, প ধ নি সা।

৩। সা রে রে ম, প ধ নি সা।

৪। সা রে রে ম, প ধ নি সা।

৫। সা রে রে ম, প ধ নি সাঁ।

৬। সা রে রে ম, প নি নি সাঁ

পূর্ব্ব মেলার্দ্ধ ছয়টি অতএব সম্পূর্ণ ঠাট ৬×৬=৩৬টি হইবে। উক্ত ৩৬টি মেলের শুদ্ধ মধ্যম স্থানে তীব্র মধ্যম ব্যবহার করিলে পুনরায় ৩৬টি মেল উৎপন্ন হইতে পারে। পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখী এই প্রকারে মেল সংখ্যা ৩৬+৩৬=৭২টি বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।

রাগ বিশেষের ঠাট নির্ণয়ের স্থবিধার জন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে উপরোক্ত ৭২টি ঠাট হইতে নিম্নলিখিত ১০টি ঠাট মানিয়া লইয়াছেন।

১। বিলাবল ঠাট—সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

২। কল্যাণ „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৩। খমাজ „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৪। ভৈরব „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৫। পূর্বী „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৬। মারবা „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৭। কাফী „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৮। আসাবরী „—সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৯। ভৈরবী „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

১০। তোড়ী „ —সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

ঠাট ও রাগ

ঠাট	রাগ
১। রাগ উৎপাদনে সমর্থ বিশিষ্ট স্বর রচনাকে ঠাট বলা হয়। যথা—কল্যাণ, ভৈরব ইত্যাদি	১। রাগ স্বর সমূহের বিশিষ্ট রচনা যাহা বর্ণ এবং অলঙ্কারের সাহায্যে সৌন্দর্য্যপ্রাপ্ত হইয়া লোকচিত্ত রঞ্জন করে। যথা—বেহাগ, ভৈরবী ইত্যাদি।
২। ঠাট সপ্তকের অন্তর্গত ১২টি স্বর হইতে উৎপন্ন হয়।	২। রাগ ঠাট হইতে উৎপন্ন হয়।
৩। ঠাট সংখ্যা—দাক্ষিণাত্যের পণ্ডিত ব্যঙ্কটমখীর মতে ৭২টি ঠাট হইতে পারে, কিন্তু হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতিতে ১০টি ঠাট মানা হয়। যথা—বিলাবল, কল্যাণ, খমাজ, ভৈরব, পূর্বী, মারবা, কাফী, আসাবরী, ভৈরবী, তোড়ী।	৩। রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয়—সম্পূর্ণ, ষাড়ব এবং ঔড়ব। কিন্তু আরোহ এবং অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগের জাতি ৯ প্রকার হয়। যথা— ১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ। ২। ” —ষাড়ব। ৩। ” —ঔড়ব। ৪। ষাড়ব—সম্পূর্ণ। ৫। ” —ষাড়ব। ৬। ” —ঔড়ব।

ঠাট	রাগ
	৭। ঔড়ব—সম্পূর্ণ। ৮। „ —ষাড়ব। ৯। „ —ঔড়ব। উপরোক্ত ৯ প্রকারের জাতি হইতে মোট ৩৪৮৪৮টি রাগ হইতে পারে।
৪। ঠাটের স্বর সমূহ 'সা রে গ ম' এইরূপ ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয়।	৪। রাগের স্বর সমূহ সব সময় ক্রমানুসারে ব্যবহৃত হয় না। যথা—কেদার রাগ— সা ম, ম প ধ প, নি ধ র্সা র্সা নি ধ প, ম প ধ প ম, গ ম রে সা।
৫। ঠাটে একই স্বরের দুই রূপ যথা 'রে রে' পর পর প্রয়োগ করা যায় না (উত্তর ভারতীয় পদ্ধতি অনুসারে)।	৫। সাধারণ নিয়মে রাগে একই স্বরের দুইরূপ পর পর প্রয়োগ করা হয় না। কিন্তু কোনও কোনও রাগে ঐরূপ প্রয়োগ বিধি ও দেখা যায়। যথা— ললিত রাগে— 'নি রে গ ম ম ম'

ঠাট	রাগ
৬। ঠাটে 'ম' এবং 'প' বর্জ্জিত হয় না।	৬। রাগে 'ম' এবং 'প' একই সঙ্গে বর্জ্জিত হয় না, দুইটির কোন ও একটি বর্জ্জিত হইতে পারে। যথা—ভূপালীতে—'ম' বর্জ্জিত মারবাতে—'প' ,,
৭। ঠাটে কেবল মাত্র আরোহ আছে। যথা—কল্যাণ ঠাট সা রে গ ম প ধ নি সা	৭। রাগে আরোহ এবং অবরোহ দুইই আছে। যথা :— ইমন রাগ— সা রে গ ম প ধ নি সা। সা নি ধ প ম গ রে সা।
৮। কোন ও ঠাট হইতে উৎপন্ন কোনও বিশেষ রাগের নামানুসারে ঐ ঠাট পরিচিত। যথা—ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী রাগের মধ্য হইতে ভৈরব রাগের নামে ভৈরব ঠাট পরিচিত।	৮। প্রত্যেক রাগই নিজ নিজ নামে পরিচিত।
৯। ঠাটে রঞ্জকতার প্রয়োজন নাই।	৯। রাগ মাত্রই রঞ্জকতাপূর্ণ। "রঞ্জয়তি ইতি রাগঃ"
১০। ঠাটে অবরোহ নাই বলিয়া উহা সম্পূর্ণরূপে গাওয়া যায় না। আরোহে ব্যবহৃত স্বর সমূহই গাওয়া যায় মাত্র।	১০। রাগে আরোহ, অবরোহ আছে এবং উহা রঞ্জকতাপূর্ণ, কাজেই রাগকে আলাপ, তাল, গমক, মীড়, তান প্রভৃতির সাহায্যে গাওয়া যায়।

রাগ সংখ্যা

রাগের জাতি সাধারণতঃ তিন প্রকার বলিয়া মানা হয়—সম্পূর্ণ, ষাড়ব ও ঔড়ব এবং উহাতে যথাক্রমে ৭টি, ৬টি এবং ৫টি স্বর লাগে। কিন্তু আরোহ এবং অবরোহের স্বর সংখ্যার দিক দিয়া বিচার করিলে রাগের জাতি ৯ প্রকার হয়। যথা :—

১। সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ।
২। ,, —ষাড়ব।
৩। ,, —ঔড়ব।
৪। ষাড়ব—সম্পূর্ণ।
৫। ,, —ষাড়ব।
৬। ,, —ঔড়ব।
৭। ঔড়ব—সম্পূর্ণ।
৮। ,, —ষাড়ব।
৯। ,, —ঔড়ব।

এখন উপরোক্ত প্রত্যেক জাতি হইতে কতটি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে তাহা নিম্নলিখিত সাঙ্কেতিক নিয়মের সাহায্যে অতি সহজেই জানিতে পারা যায়।

সাঙ্কেতিক নিয়ম { সম্পূর্ণ = ১
ষাড়ব = ৬
ঔড়ব = ১৫

এই নিয়মে রাগ সংখ্যা নিম্নোক্ত রূপে নির্ণয় করা যায়।

যথা :—

সম্পূর্ণ—সম্পূর্ণ = ১ × ১ = ১
,, —ষাড়ব = ১ × ৬ = ৬
,, —ঔড়ব = ১ × ১৫ = ১৫

যাড়ব—সম্পূর্ণ = ১ × ৬ = ৬
„ —ষাড়ব = ৬ × ৬ = ৩৬
„ —ঔড়ব = ৬ × ১৫ = ৯০
ঔড়ব—সম্পূর্ণ = ১৫ × ১ = ১৫
„ —ষাড়ব = ১৫ × ৬ = ৯০
„ —ঔড়ব = ১৫ × ১৫ = ২২৫

মোট— ৪৮৪ টি

কাজেই দেখা যাইতেছে কেবলমাত্র একটী ঠাট হইতেই ৪৮৪টী রাগ উৎপন্ন হইতে পারে। ঠাট সংখ্যা ৭২টী মানা হইলে রাগ সংখ্যা মোট ৪৮৪ × ৭২ = ৩৪৮৪৮ টী মানা যাইতে পারে। যাহা হউক সাধারণতঃ যে সকল রাগ গাওয়া হইয়া থাকে তাহাদের সংখ্যা দুই শতের অধিক নহে।

বিভিন্ন জাতীয় রাগের সংখ্যা নিরূপণের পদ্ধতি ঃ— রাগের আরোহ ষাড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর এবং অবরোহ ষাড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। ঠিক একই নিয়মে আরোহে ঔড়ব হইলে প্রতিবার নীচের দিক হইতে দুইটি করিয়া স্বর এবং অবরোহে ঔড়ব হইলে প্রতিবার উপরের দিক হইতে দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। নিম্নের উদাহরণ দুইটীর দ্বারাই এই পদ্ধতির স্বরূপ সুস্পষ্ট হইবে।

যথা ঃ—বিলাবল ঠাট হইতে 'ষাড়ব-ষাড়ব' এবং ঔড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগ কয়টী হইতে পারে।

১। বিলাবল ঠাট হইতে ষাড়ব-ষাড়ব জাতীয় রাগ মোট ৩৬টী হইতে পারে। এই জাতীয় রাগে আরোহে ৬টী এবং অবরোহে ৬টী স্বর লাগে।

ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেক বার উপরের দিক হইতে একটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে।
উহা এইরূপ ঃ—

আরোহ	অবরোহ
১। সা গ ম প ধ নি র্সা	র্সা ধ প ম গ রে সা।
২। সা রে ম প ধ নি র্সা	র্সা নি প ম গ রে সা।
৩। সা রে গ প ধ নি র্সা	র্সা নি ধ ম গ রে সা।
৪। সা রে গ ম ধ নি র্সা	র্সা নি ধ প গ রে সা।
৫। সা রে গ ম প নি র্সা	র্সা নি ধ প ম রে সা।
৬। সা রে গ ম প ধ র্সা	র্সা নি ধ প ম গ সা।

এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ষাড়ব আরোহের সহিত ৬টী করিয়া ষাড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ৬×৬=৩৬টী রাগ হইতে পারে।

২। বিলাবল ঠাট হইতেই ঔড়ব-ঔড়ব জাতীয় রাগ মোট ২২৫টী হইতে পারে। এই জাতীয় রাগে আরোহে ৫টী এবং অবরোহে ৫টী স্বর লাগে। ইহাতে আরোহে প্রত্যেকবার নীচের দিক হইতে এবং অবরোহে প্রত্যেক বার উপরের দিক হইতে দুইটি করিয়া স্বর বাদ দিতে হইবে। উহা এইরূপ—

রে গ, রে ম, রে প, রে ধ, রে নি,	নি ধ, নি প, নি ম, নি গ, নি রে,
গ ম, গ প, গ ধ, গ নি,	ধ প, ধ ম, ধ গ, ধ রে,
ম প, ম ধ, ম নি,	প ম, প গ, প রে,
প ধ, প নি,	ম গ, ম রে,
ধ নি,	গ রে,

আরোহ	অবরোহ
১। সা ম প ধ নি সা̇	সা̇ প ম গ রে সা।
২। সা গ প ধ নি সা̇	সা̇ ধ ম গ রে সা।
৩। সা গ ম ধ নি সা̇	সা̇ ধ প গ রে সা।
৪। সা গ ম প নি সা̇	সা̇ ধ প ম রে সা।
৫। সা গ ম প ধ সা̇	সা̇ ধ প ম গ সা।
৬। সা রে প ধ নি সা̇	সা̇ নি ম গ রে সা।
৭। সা রে ম ধ নি সা̇	সা̇ নি প গ রে সা।
৮। সা রে ম প নি সা̇	সা̇ নি প ম রে সা।
৯। সা রে ম প ধ সা̇	সা̇ নি প ম গ সা।
১০। সা রে গ ধ নি সা̇	সা̇ নি ধ গ রে সা।
১১। সা রে গ প নি সা̇	সা̇ নি ধ ম রে সা।
১২। সা রে গ প ধ সা̇	সা̇ নি ধ ম গ সা।
১৩। সা রে গ ম নি সা̇	সা̇ নি ধ প রে সা।
১৪। সা রে গ ম ধ সা̇	সা̇ নি ধ প গ সা।
১৫। সা রে গ ম প সা̇	সা̇ নি ধ প ম সা।

এখন উপরোক্ত প্রত্যেকটি ঔড়ব-আরোহের সহিত ১৫টি করিয়া ঔড়ব অবরোহ যোগ দিলে উপরোক্ত ঠাট হইতে মোট ১৫ × ১৫ = ২২৫টি রাগ উৎপন্ন হইতে পারে।

পূর্ব্ব রাগ ও উত্তর রাগ

পূর্ব্ব রাগ :—

যদি কোন ও রাগের বাদী স্বরটি সপ্তকের পূর্ব্বাঙ্গ অর্থাৎ 'সা রে গ ম প' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহা হইলে উহাকে পূর্ব্বরাগ অথবা পূর্ব্বাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। পূর্ব্বরাগ গাহিবার মোটামুটি সময় দিন ১২টা হইতে রাত্রি ১২টা।

উদাহরণ—পূর্বী, মূলতানি, পুরিয়া, কল্যাণ, কাফী ইত্যাদি।

উত্তর রাগ :—

যদি কোন ও রাগের বাদী স্বরটি সপ্তকের উত্তরাঙ্গ অর্থাৎ 'ম প ধ নি সা' এই স্বরগুলির মধ্যে কোনও একটি হয় তাহাহইলে উহাকে উত্তর রাগ অথবা উত্তরাঙ্গবাদী রাগ বলা হয়। উত্তর রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় রাত্রি ১২টা হইতে দিন ১২টা।

উদাহরণ—মালকৌষ, মল্লার, বসন্ত, ললিত, ভৈরব, জৌনপুরী, ভৈরবী তোড়ী ইত্যাদি।

'ম' এবং 'প' সপ্তকের পূর্ব্ব এবং উত্তর উভয় অঙ্গেই আছে কাজেই 'ম' কিংবা 'প' কোন ও রাগের বাদী স্বর হইলে উক্ত রাগ নিজ প্রকৃতি অনুযায়ী পূর্ব্বাঙ্গবাদী অথবা উত্তরাঙ্গবাদী হইবে।

যথা—ভীমপলাশী এবং বাগেশ্রী উভয় রাগেই 'ম' বাদীস্বর কিন্তু প্রকৃতি বিচারে প্রথমটিকে পূর্ব্বরাগ এবং দ্বিতীয়টিকে উত্তররাগ বলিয়া মানিয়া লইয়া উহাদের গাহিবার সময় যথাক্রমে দিন ১২—৩টা এবং রাত্রি ১২—৩টা বলিয়া নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে।

সন্ধি প্রকাশ রাগ

দুই বস্তুর মিলনকে 'সন্ধি' বলা হয়। এখানে 'সন্ধি' শব্দের অর্থ দিন এবং রাত্রির মিলন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই মিলন দুইবার হয়—উষাকালে এবং সায়ংকালে। কিন্তু এই মিলন ক্ষণ এত স্বল্প স্থায়ী যে ঐ সময়ের মধ্যে কোনও রাগ গাওয়া কিংবা বাজানো সম্ভব নয়।

কাজেই সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞগণ সুবিধার জন্য ঐ মিলন-সময়কে ৪—৭টা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছেন।

যে রাগ দিবারাত্রির উক্ত মিলন সময়কে প্রকাশ অথবা সূচিত করে তাহাকেই সন্ধি-প্রকাশ-রাগ বলা হয়।

দিন রাত্রির ২৪ ঘণ্টাকে ভোর ৪টা হইতে অপরাহ্ন ৪টা এবং পুনরায় অপরাহ্ন ৪টা হইতে ভোর ৪টা পর্য্যন্ত দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া প্রথমতঃ প্রাতঃকালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ অথবা প্রথম শ্রেণীর রাগ তৎপর প্রাতঃকালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগ গাওয়া হয়। পুনরায় সায়ংকালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ তৎপর সায়ংকালীন দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর রাগের মোটামুটি সময় নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের বৈশিষ্ট্য-নির্ণয় পদ্ধতি এবং রাগগুলি কোন্ শ্রেণী ভুক্ত তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

রাগের বৈশিষ্ট-নির্ণয় পদ্ধতি—

সন্ধি প্রকাশ অথবা ১ম শ্রেণীর রাগ ভৈরব, পূর্বী এবং মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন।

১। ভৈরব ঠাট ঃ— সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

২। পূর্বী ”ঃ— সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

৩। মারবা ”ঃ— সা রে গ ম প ধ নি সাঁ।

বৈশিষ্ট্য— রে গ নি

উপরোক্ত ঠাট সমূহের অন্তর্গত স্বরগুলির সমালোচনায় ইহাই প্রতিপন্ন হয় যে সন্ধি প্রকাশ রাগে' 'রে' কোমল এবং 'গ' ও 'নি' শুদ্ধ হইবেই। ম ও ধ কোমল কিংবা তীব্র দুইই হইতে পারে।

দ্বিতীয় শ্রেণীর রাগ—এই শ্রেণীর রাগ কল্যাণ, বিলাবল এবং খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন।

১। কল্যাণ ঠাট—সা রে গ ম̍ প ধ নি সা̇।

২। বিলাবল „ —সা রে গ ম প ধ নি সা̇।

৩। খমাজ „ —সা রে গ ম প ধ $\underline{\text{নি}}$ সা̇।

বৈশিষ্ট্য— রে গ ধ

অতএব এই শ্রেণীর রাগে 'রে', 'গ' এবং 'ধ' শুদ্ধ হইবেই। ম এবং নি কোমল কিংবা তীব্র দুইই হইতে পারে।

তৃতীয় শ্রেণীর রাগ—এই শ্রেণীর রাগ কাফী, আসাবরী, ভৈরবী এবং তোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন।

১। কাফী— সা রে $\underline{\text{গ}}$ ম প ধ $\underline{\text{নি}}$ সা̇।

২। আসাবরী—সা রে $\underline{\text{গ}}$ ম প $\underline{\text{ধ}}$ $\underline{\text{নি}}$ সা̇।

৩। ভৈরবী— সা $\underline{\text{রে}}$ $\underline{\text{গ}}$ ম প $\underline{\text{ধ}}$ $\underline{\text{নি}}$ সা̇।

৪। তোড়ী— সা $\underline{\text{রে}}$ $\underline{\text{গ}}$ ম̍ প $\underline{\text{ধ}}$ নি সা̇।

বৈশিষ্ট্য— $\underline{\text{গ}}$

অতএব এই শ্রেণীর রাগে '$\underline{\text{গ}}$' কোমল হইবেই। রে, ম, ধ এবং নি কোমল কিংবা তীব্র দুইই হইতে পারে।

বিভিন্ন শ্রেণীর কতিপয় রাগ ঃ—

প্রাতঃ কালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ঃ—

১। ভৈরব ঠাট— ভৈরব, কালিংগড়া, রামকলী, জোগিয়া, বিভাস।

২। পূর্বী „ — বসন্ত, পরজ।

৩। মারবা „ — সোহনী, ললিত।

প্রাঃ ২য় শ্রেণীর রাগ ঃ—

১। কল্যাণ ঠাট— গৌড়সারং, হিণ্ডোল।

২। বিলাবল ,, — বিলাবল, দেশকার।

৩। খমাজ ,, — ×

প্রাঃ ৩য় শ্রেণীর রাগ ঃ—

১। কাফী ঠাট— বৃন্দাবনী সারঙ্গ, ভীমপলাশী, পীলু।

২। আসাবরী ,, — আসাবরী, জৌনপুরী।

৩। ভৈরবী ,, — ভৈরবী।

৪। তোড়ী ,, — তোড়ী, মূলতানী।

সায়ং কালীন সন্ধি প্রকাশ রাগ ঃ—

১। ভৈরব ঠাট— ×

২। পূর্বী ,, —পূর্বী, শ্রী, পুরিয়াধানশ্রী।

৩। মারবা ,, —মারবা, পুরিয়া।

সাঃ ২য় শ্রেণীর রাগ ঃ—

১। কল্যাণ ঠাট— ইমন, ইমন কল্যাণ, ভূপালী, হমীর, কেদার, শুদ্ধ কল্যাণ, কামোদ, ছায়ানট।

২। বিলাবল ঠাট— বিহাগ, শঙ্করা, দুর্গা।

৩। খমাজ ,, —খমাজ, দেশ, তিলককামোদ, জয়জয়ন্তী, ঝিঁঝোটি।

সাঃ ৩য় শ্রেণীর রাগ ঃ

১। কাফী ঠাট—কাফী, বাগেশ্রী, গৌড়মল্লার, মিয়াঁমল্লার, বহার।

২। আসাবরী ঠাট—দরবারী কানড়া, অড়াণা।

৩। ভৈরবী ,, — মালকোঁস।

৪। তোড়ী ,, — ×

বিভিন্ন শ্রেণীর রাগের মোটামুটি সময় :—

প্রাতঃ কালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ— ৪ — ৭ টা (সকাল)
" দ্বিতীয় শ্রেণীর " — ৭ — ১১ " "
" তৃতীয় " " — ১১ — ৪ " (অপরাহ্ন)
সায়ং কালীন সন্ধিপ্রকাশ রাগ — ৪ — ৭ টা (সন্ধ্যা)
" দ্বিতীয় শ্রেণীর " — ৭ — ১১ " (রাত্রি)
" তৃতীয় " " —১১ — ৪ " (ভোর)

শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সঙ্কীর্ণ রাগ

শুদ্ধ রাগ :—

সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী রাগ বিশেষকে উহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়া অন্য কোন ও রাগের সাহায্য ছাড়া গাওয়া হইলে উহাকে শুদ্ধ রাগ বলা হয়।

উদাহরণ—হিন্দুস্থানী সঙ্গীত পদ্ধতির ইমন, খমাজ, ভৈরব প্রভৃতি দশটি ঠাট বাচক রাগকেই কেবল মাত্র শুদ্ধ রাগ বলা যাইতে পারে। ইহা ছাড়া অন্যান্য রাগ ছায়ালগ কিংবা সঙ্কীর্ণ জাতীয়।

ছায়ালগ রাগ :—

সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী মূল রাগ অথবা আশ্রয় রাগ অর্থাৎ ঠাট বাচক রাগের ছায়ার অবলম্বনে রচিত রাগকে ছায়ালগ-রাগ বলা হয়।
যথা—কল্যাণ ঠাট হইতে—ভূপালী, হমীর, শুদ্ধ কল্যাণ ইত্যাদি।
কাফী " " বাগেশ্রী, বহার ইত্যাদি।

সঙ্কীর্ণ রাগ—

সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী ঠাট বাচক রাগ এবং ছায়ালগ রাগের সংমিশ্রণে রচিত রাগকে সঙ্কীর্ণ রাগ বলা হয়। যথা—পীলু।

শুদ্ধ রাগকে বিরাট বটবৃক্ষের সহিত, ছায়ালগ রাগকে বটবৃক্ষের ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত অপেক্ষাকৃত নিম্নশির বৃক্ষের সহিত এবং সঙ্কীর্ণ রাগকে উহাদের সম্মিলিত ছায়ায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত বৃক্ষ-শিশুগুলির সহিত তুলনা করা যাইতে পারে।

গ্রহ, অংশ এবং ন্যাস স্বর

গ্রহ ও ন্যাস স্বর—

প্রাচীনকালে বিভিন্ন রাগকে নির্দ্দিষ্ট স্বর হইতে আরম্ভ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্বরে শেষ করিবার পদ্ধতি ছিল। উক্ত স্বর দুইটিকে যথাক্রমে গ্রহ এবং ন্যাস স্বর বলা হইত। বর্ত্তমান কালে রাগ গাহিবার উপরোক্ত নিয়ম অনুসরণ করা হয় না। রাগে ব্যবহৃত মুখ্য স্বর সমূহের মধ্যে যে কোন স্বর হইতে রাগ আরম্ভ করা হয় এবং যে কোন স্বরে সমাপ্ত করা হইয়া থাকে।

আধুনিক কালে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে 'গ্রহ' কথাটির ব্যবহার নাই কিন্তু 'ন্যাস' কথাটি প্রকারান্তরে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। কোনও রাগ গাহিবার সময় যে মুখ্য স্বরগুলির উপর পুনঃ পুনঃ বিশ্রাম করিয়া রাগের স্বরূপ প্রকাশ করা হয় উহাদিগকে ঐ রাগের ন্যাস স্বর বলা হয়। বাদী এবং সম্বাদী স্বর প্রত্যেক রাগেরই ন্যাস স্বর। ইহা ছাড়া ও অনুবাদী স্বরগুলির মধ্য হইতে একটি কিংবা একাধিক স্বর ন্যাস স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয়।

যথা—কেদার রাগে—ম, সা, প।

জৌনপুরী „ —ধ, গ, প।

ভীমপলাশী —ম, সা, গ, নি।

অংশ স্বর—

প্রাচীনকালে কোনও রাগে যে স্বরটি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রয়োগ করা হইত তাহাকে 'অংশ স্বর' বলা হইত।

'বহুলত্বং প্রয়োগেষু সচাংশস্বর উচ্যতে'।

সঙ্গীত-দর্পণ।

অংশ স্বরকে বর্ত্তমান কালে বাদী স্বর বলা হয়। কিন্তু কেবল মাত্র বহুল প্রয়োগই বাদী স্বরের বৈশিষ্ট্য নয়। যে স্বরটি রাগ বিশেষে

পুনঃ পুনঃ প্রয়োগ করা হয় এবং রাগের স্বরূপ নির্ণয়ে সর্ব্বাধিক সাহায্য করে উহাকেই 'বাদী স্বর' আখ্যা দেওয়া হয়।

উদাহরণ—জৌনপুরী রাগে 'ধ়' অপেক্ষা 'প' এর প্রয়োগ অনেক বেশী কিন্তু 'প' ঐ রাগের বাদী স্বর নয়। রাগের স্বরূপ নির্ণয়ে 'ধ়' অধিকতর সাহায্য করে বলিয়া উহাই জৌনপুরী রাগের বাদী স্বর বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

বাদী স্বরের সাহায্যে কোন ও রাগ 'উত্তর রাগ' কিংবা 'পূর্ব্ব রাগ' তাহা জানা যায় এবং ঐ রাগ গাহিবার মোটামুটি সময় নিরূপণ করা যায়।

(পূর্ব্বরাগ ও উত্তররাগাংশে দ্রষ্টব্য)

গায়কের গুণ ও দোষ

হৃদ্যশব্দঃ সুশারিরো গ্রহমোক্ষবিচক্ষণঃ।
রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ॥
প্রবন্ধগাননিষ্ণাতো বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ।
সর্ব্বস্থানোচ্চগমকেষ্বনায়াসলসদ্‌গতিঃ॥
আয়ত্বকণ্ঠস্তালজ্ঞঃ সাবধানো জিতশ্রমঃ।
শুদ্ধচ্ছায়ালগাভিজ্ঞঃ সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ॥
অপারস্থায়সঞ্চারঃ সর্বদোষবিবর্জিতঃ।
ক্রিয়াপরোঽজস্রলয়ঃ সুঘটো ধারণান্বিতঃ॥
স্ফূর্জন্নির্জবনো হারিরহঃকৃদ্‌ভজনোদ্‌ধুরঃ।
সুসম্প্রদায়ো গীতজ্ঞৈর্গীয়তে গায়নাগ্রণোঃ॥

"রত্নাকর"

গুণ :—

১। হৃদ্যশব্দঃ—সুমধুর কণ্ঠস্বর বিশিষ্ট।

২। সুশারীরঃ—যাহার আওয়াজ অভ্যাস ছাড়াই রাগ বিশেষের স্বরূপ প্রকাশ করিতে সমর্থ।

৩। গ্রহ মোক্ষ বিচক্ষণঃ—'গ্রহ' এবং 'ন্যাস' স্বরের প্রয়োগ-বিধি যাহার জানা আছে।

৪। রাগরাগাঙ্গভাষাঙ্গক্রিয়াঙ্গোপাঙ্গকোবিদঃ—রাগাঙ্গ, ভাষাঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ এবং উপাঙ্গ সম্বন্ধে যাহার সম্যক জ্ঞান আছে। এখানে রাগাঙ্গ অর্থাৎ রাগের বিভিন্ন অঙ্গ অথবা অংশ, ভাষাঙ্গ অর্থাৎ রাগে গেয় গানের ভাষা, ক্রিয়াঙ্গ অর্থাৎ রাগ গাইবার স্বতন্ত্র নিয়ম এবং উপাঙ্গ অর্থাৎ ছোট ছোট স্বর রচনার সাহায্যে রাগের আলাপ।

৫। প্রবন্ধগাননিষ্ণাতঃ—প্রাচীনকালে প্রচলিত প্রবন্ধ গান সম্বন্ধে যিনি অভিজ্ঞ।

৬। বিবিধালপ্তিতত্ত্ববিৎ—বিবিধ প্রকার আলপ্তি সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। আলপ্তি একপ্রকার প্রাচীন গীত।

৭। সর্বস্থানোচ্চগমকেম্বনায়াসলসদ্‌গতিঃ—যিনি মন্দ্র, মধ্য এবং তার তিন স্থানের গমকে পটু।

৮। আয়ত্বকণ্ঠঃ—যিনি কণ্ঠ স্বরকে ইচ্ছামত ব্যবহার করিতে পারেন।

৯। তালজ্ঞঃ—বিভিন্ন তাল সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।

১০। সাবধানঃ—যিনি একাগ্রচিত্তে গান করিতে পারেন।

১১। জিতশ্রমঃ—গান গাহিবার সময় যাহাকে পরিশ্রান্ত দেখায় না।

১২। শুদ্ধছায়ালগাভিজ্ঞঃ—শুদ্ধ, ছায়ালগ এবং সঙ্কীর্ণ রাগ সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।

১৩। সর্ব্বকাকুবিশেষবিৎ—সঙ্গীত শাস্ত্রোক্ত ছয় প্রকার কাকু সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে। পণ্ডিত কল্লিনাথ কাকুর এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—'কাকুর্ধ্বনের্বিকারঃ' অর্থাৎ কাকুধ্বনির (সঙ্গীতোপযোগী আওয়াজের) বিকার অথবা বিশেষ রূপ। কাকু ছয় প্রকার যথা:—স্বরকাকু, রাগকাকু, দেশকাকু, ক্ষেত্রকাকু, অন্যরাগকাকু, যন্ত্রকাকু।

১৪। অপার স্থায় সঞ্চারঃ —যিনি গাহিবার সময় গানের অসংখ্য স্থায় অর্থাৎ রাগাবয়ব রচনা করিতে সমর্থ।

১৫। সর্বদোষবিবর্জিতঃ —যিনি শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুযায়ী নির্দ্দোষ ভাবে গাহিতে পারেন।

১৬। ক্রিয়াপরঃ —যিনি নিয়মিত অভ্যাস দ্বারা সঙ্গীতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

১৭। অজস্রলয়ঃ —নানা প্রকার লয় সম্বন্ধে যাহার জ্ঞান আছে।

১৮। সুঘটঃ—যাহার গান শ্রোতাগণের মনোমুগ্ধকর।

১৯। ধারণান্বিতঃ —মেধাবী অর্থাৎ যিনি উত্তম স্মৃতি শক্তি বিশিষ্ট।

২০। স্ফূর্জন্নির্জবনঃ —'যিনি 'নির্জবন' প্রয়োগে পটু। 'নির্জবন রাগের একটি বিশেষ অবয়ব। উহার প্রকৃতি মেঘ গর্জ্জনের ন্যায় গম্ভীর।

২১। হারিরহঃকৃদ্ভজনোদ্‌বুরঃ —যিনি সুমধুর সঙ্গীতের সাহায্যে শ্রোতার মন মুগ্ধ করিতে সমর্থ।

২২। সুসম্প্রদায়ঃ —যিনি গুরুপরম্পরা উত্তম সম্প্রদায়ভুক্ত।

দোষ ঃ—

সংদষ্টোদ্‌ঘৃষ্টসুৎকারিভীতশঙ্কিতকম্পিতাঃ।
করালী বিকলঃ কাকী বিতালকরভোদ্ভড়াঃ॥
ঝোম্বককস্তুম্বকী বক্রী প্রসারী বিনিমীলকঃ।
বিরসাপস্বরাব্যক্তস্থানভ্রষ্টাব্যবস্থিতাঃ॥
মিশ্রকোঽনবধানশ্চ তথাঽন্যঃ সানুনাসিকঃ।
পঞ্চবিংশতিরিত্যেতে গায়কা নিন্দিতা মতাঃ॥

"রত্নাকর"

১। সংদষ্টঃ—যিনি দাঁত পিসিয়া গান করেন।

২। উদ্‌ঘৃষ্টঃ—যিনি কর্কশ চীৎকার করিয়া গান করেন।

৩। সূৎকারী—যিনি সূতকার অর্থাৎ এঁ এঁ এইরূপ শব্দ করিয়া গান করেন।

৪। ভীতঃ —যিনি ভয়ে ভয়ে গান করেন।

৫। শঙ্কিতঃ —যিনি অনর্থক শঙ্কিত ও উত্তলা হইয়া গান করেন।

৬। কম্পিতঃ —যিনি কম্পিত আওয়াজে গান করেন।

৭। করালী—যিনি বিকট হা করিয়া গান করেন।

৮। বিকলঃ —যাহার গানে স্বর স্থান ঠিক থাকে না।

৯। কাকী—যিনি কাকের মত কর্কশ স্বরে গান করেন।

১০। বিতালঃ —যিনি একটু পরে পরেই তালভ্রষ্ট হন।

১১। করভঃ —যিনি উর্দ্ধ্ব মুখ হইয়া গান করেন।

১২। উদ্বড়ঃ —ভেড়ার মত মুখব্যাদন করিয়া যিনি গান করেন।

১৩। ঝোম্বকঃ —যিনি গলার শিরা ফুলাইয়া গান করেন।

১৪। তুম্বকী—তুম্বার মত মুখ ফুলাইয়া যিনি গান করেন।

১৫। বক্রী—মুখ বাঁকা করিয়া যিনি গান করেন।

১৬। প্রসারী—যিনি হাত পা ছুড়িয়া গান করেন।

১৭। নিমীলকঃ —যিনি চোখ বন্ধ করিয়া গান করেন।

১৮। নিরসঃ —যাহার গানে কোন মাধুর্য্য নাই।

১৯। অপস্বরঃ —যিনি ভ্রমবশতঃ বর্জ্জিতস্বর প্রয়োগ করিয়া গান করেন।

২০। অব্যক্তঃ —যিনি গানের শব্দ স্পষ্টভাবে উচ্চারণ করেন না।

২১। স্থানভ্রষ্টঃ —যাহার আওয়াজ যথাস্থানে পৌঁছায় না।

২২। অব্যবস্থিতঃ —যিনি মনস্থির করিয়া যথাযথ ভাবে গান করিতে পারেন না।

২৩। মিশ্রকঃ —যিনি রাগের শুদ্ধতা রক্ষা না করিয়া উহাকে অন্য রাগের সহিত মিশাইয়া গাহিয়া থাকেন।

২৪। অনবধানঃ —যিনি গানের নিয়ম উপেক্ষা করিয়া নিজের খেয়াল অনুযায়ী গাহিয়া থাকেন।

২৫। সানুনাসিকঃ —যিনি নাকিসুরে গান করিয়া থাকেন।

শ্রুতি

প্রাচীন এবং আধুনিক সঙ্গীত শাস্ত্রজ্ঞগণ শ্রুতির নানাবিধ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। উহাদের মধ্যে কোন্‌টি প্রণিধান যোগ্য তাহা নিম্নোক্ত আলোচনা দ্বারা বুঝা যাইবে।

প্রাচীন গ্রন্থকারের মতে—

১। **'শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যত্বাদ্ধ্বনিরেব শ্রুতির্ভবেৎ**

অর্থাৎ শ্রবণেন্দ্রিয়গ্রাহ্যধ্বনিই শ্রুতি।

২। **'শ্রুয়তে ইতি শ্রুতি'ঃ**

শোনা যায় এমন যে কোন শব্দই শ্রুতি।

শ্রুতি সম্বন্ধে উপরোক্ত ব্যাখ্যা দুইটিরই মর্ম্মার্থ এক। কিন্তু শ্রুতির সংজ্ঞা হিসাবে উহাদিগকে নির্ভুল বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। আওয়াজ দুই প্রকার—সঙ্গীত-উপযোগী অর্থাৎ নাদ এবং সঙ্গীত-অনুপযোগী অর্থাৎ গোলমাল। সঙ্গীতে প্রথমোক্ত আওয়াজ অথবা শব্দের সঙ্গেই আমাদের সম্বন্ধ। কানে শোনা গেলেই যদি শ্রুতি হয় তাহা হইলে শেষোক্ত আওয়াজকে সঙ্গীতে স্থান দেওয়া উচিৎ কিন্তু উহা মোটেই সম্ভব নয়। কাজেই শ্রুতির পূর্ব্বোক্ত ব্যাখ্যা দুইটি ভাষাবিদের দৃষ্টিতে অভ্রান্ত হইলেও সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে ভ্রান্তিমূলক। সঙ্গীতজ্ঞের দৃষ্টিতে সমস্ত শ্রুতিই শব্দ বটে কিন্তু সমস্ত শব্দই শ্রুতি নয়।

আধুনিক গ্রন্থকারের মতে—

১। **নিত্যং গীতোপযোগিত্বমভিজ্ঞেয়ত্বমপ্যুত।**

লক্ষ্যে প্রোক্তংসুপর্য্যাপ্তং সঙ্গীতশ্রুতি লক্ষণম॥

সঙ্গীতোপযোগী যে শব্দগুলি সুস্পষ্ট শোনা যায় এবং যাহাদের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যায় তাহাদিগকে শ্রুতি বলে।

শ্রুতির উপরোক্ত ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে সত্য কিন্তু ঐরূপ সংজ্ঞা নির্দ্দেশ ভ্রমাত্মক। ব্যাখ্যায় শ্রুতির তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হইয়াছে। যথা—

(ক) উহারা সঙ্গীতোপযোগী।

(খ) উহাদিগকে সুস্পষ্ট শোনা যাইবে।

(গ) উহাদের পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করা যাইবে। প্রথম দুইটির সম্বন্ধে বলিবার কিছু নাই কিন্তু তৃতীয় বৈশিষ্ট্যের দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে পরস্পরের ব্যবধান নির্ণয় করিবার জন্য আমাদিগকে সব সময়ই একাধিক সঙ্গীতোপযোগী আওয়াজ উচ্চারণ করিতে হইবে অর্থাৎ কেবল মাত্র একটি সঙ্গীতোপযোগী শব্দ উচ্চারণ করিলে উহাকে 'শ্রুতি' বলা যাইতে পারে না। অতএব উপরোক্ত ব্যাখ্যা শ্রুতির সংজ্ঞা হইতে পারে না।

২। "স্বরের সূক্ষ্মাংশকে শ্রুতি বলে অর্থাৎ এক স্বর হইতে অন্য স্বরে যাইবার সময় মধ্যে যে সূক্ষ্ম স্বর থাকে তাহাকে শ্রুতি বলে"।

শ্রুতির এইরূপ সংজ্ঞা ও ভ্রমাত্মক। প্রাচীন ও আধুনিক গ্রন্থকারগণ সকলেই সপ্তকের অন্তর্গত স্বর সংখ্যা ১২টি এবং শ্রুতি সংখ্যা ২২টি মানিয়া লইয়াছেন। গ্রন্থকার উপরোক্ত ব্যাখ্যায় স্বরের সূক্ষ্মাংশগুলিকেই শ্রুতি বলিয়া মানিয়া লইয়াছেন। স্থূল অংশগুলি অর্থাৎ স্বরগুলিকে শ্রুতি বলিয়া স্বীকার করেন নাই। অতএব গ্রন্থকারের মতে শ্রুতি সংখ্যা ১০টি দাঁড়ায় কিন্তু আসলে শ্রুতি সংখ্যা ২২টি। তথাকথিত স্থূল এবং সূক্ষ্ম দুই প্রকার অংশ সমষ্টিতেই শ্রুতি সংখ্যা ২২টি দাঁড়াইয়াছে। আমাদের সঙ্গীতে ব্যবহৃত ১২টি স্বর ২২টি শ্রুতিরই বিভিন্ন স্থানে অবস্থিত। কাজেই দেখা যাইতেছে ১২টি স্বর এবং উহাদের যে কোন ও দুইটির অন্তর্বর্ত্তী সূক্ষ্মাংশগুলি সকলেই শ্রুতিপদবাচ্য।

এখন বলা যাইতে পারে শ্রুতি এবং স্বরে যদি কোন ও পার্থক্য না থাকে তাহা হইলে স্বরসংখ্যা ২২টী ধরা হয় না কেন? ঐরূপ ধরিয়া লইতে

কোনও আপত্তি নাই তবে সুবিধার জন্য ১০টি বিশেষ শ্রুতিকে ১২টি স্বরের অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।

চতুশ্চতুশ্চতুশ্চৈব ষড়জমধ্যমপঞ্চমাঃ।
দ্বে দ্বে নিষাদগান্ধারৌ ত্রিস্ত্রী ঋষভধৈবতৌ॥

অর্থাৎ 'সা, ম এবং 'প' এর ৪ শ্রুতি, 'গ এবং নি'র ২ শ্রুতি, 'রে এবং ধ' এর তিন শ্রুতি।

প্রাচীনকাল হইতেই শুদ্ধ 'সা, রে, গ, ম, প, ধ, নি' কে যথাক্রমে ১, ৫, ৮, ১০, ১৪, ১৮, ২১ শ্রুতিস্থানে ধরিয়া লইয়া অবশিষ্ট শ্রুতিস্থানকে উহাদের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরিয়া লওয়া হইয়াছে।

উদাহরণ—উপরোক্ত 'সা, ম এবং প' এর ৪টি করিয়া শ্রুতি ধরা হইয়াছে তন্মধ্যে প্রথম শ্রুতিস্থানে অর্থাৎ ১, ১০, এবং ১৪ শ্রুতিতে যথাক্রমে সা, ম এবং 'প' অবস্থিত। '২, ৩, ৪', '১১, ১২, ১৩' এবং '১৫, ১৬, ১৭' শ্রুতিস্থানগুলি যথাক্রমে রে ম এবং ধ এর বিভিন্ন প্রকৃতির নির্দ্দেশক অর্থাৎ উহাদ্বারা তিন প্রকারের রে, ম এবং ধ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ২২টি শ্রুতিই আমাদের সঙ্গীতে ২২টি স্বর হিসাবে বিভিন্ন রাগে বিভিন্ন রূপে দেখা দেয়।

উদাহরণ স্বরূপ বিলাবল এবং বিহাগের 'নি', ভৈরব এবং পূর্বীর 'রে', কাফী এবং মল্লারের গ এর উল্লেখ করা যাইতে পারে। বিলাবল, ভৈরব এবং কাফী রাগের 'নি, রে এবং গ' বিহাগ, পূর্বী এবং মল্লারের 'নি, রে এবং গ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। কিন্তু উভয় স্থলেই উহাদিগকে স্বর বলিয়াই ধরা হয়।

উপরোক্ত আলোচনা দ্বারা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে সঙ্গীতোপযোগী যে কোনও আওয়াজকেই শ্রুতি বলা যায়। শ্রুতি, নাদ এবং স্বর বলিলে প্রকারান্তরে একই জিনিষ বুঝায়।

রাগ ভূপালী

১। ভূপালী রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে গ প, ধ, সাঁ।

অবরোহ—সা, ধ প, গ, রে, সা।

৩। পকড়—গ, রে, সা ধ়, সা রে গ, প গ, ধ প গ, রে, সা।

৪। জাতি—ঔড়ব।

৫। এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ।

৬। বাদী— গ
সম্বাদী— ধ } পূর্ব্ব রাগ। সময়—রাত্রি ১ম প্রহর

৭। আলাপ—গ, রে সা ধ় সা রে গ, প গ, ধ প গ রে সা।

গ প, সাঁ ধ, সাঁ, ধ রেঁ, ধ সাঁ ধ প গ,

প গ, রে গ, রে সা।

রাগ হম্বীর

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ, সাঁ।

৩। অবরোহ—সাঁ নি ধ প, মঁ প ধ প, গ ম রে সা।

৪। পকড়— সা, রে সা, গ ম ধ।

৫। সম্পূর্ণ।

৪। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র মঁ প্রয়োগ করা হয়।

৬। বাদী— ধ
সম্বাদী— গ } পূর্ব্ব রাগ। সময়—রাত্রি ১ম প্রহর।

পূর্ব্ব রাগের নিয়মানুযায়ী কেহ কেহ 'প' কে এই রাগের বাদী স্বর বলিয়া মানেন। কিন্তু রাগের স্বরূপ প্রকাশে ধৈবত অধিকতর সাহায্য করে বলিয়া উহাকেই এই রাগের বাদীস্বর বলিয়া মানা হয়।

৭। এই রাগে 'ম' তীব্র মধ্যমকে কেবল মাত্র আরোহে এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহ ও অবরোহে প্রয়োগ করা হয়। 'নি' আরোহে এবং 'গ' অবরোহে বক্র। কদাচিৎ নি বিবাদী স্বররূপে ব্যবহৃত হয়।

৮। আলাপ—সা রে সা, গ ম ধ, নি ধ প, ম প ধ প,
গ ম রে সা, গ ম ধ।
প প সা, সা রে সা, নি ধ সা রে সা নি ধ প,
গ ম রে সা, গ ম রে সা, গ ম ধ।

রাগ কেদার

১। এই রাগ কল্যাণ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা ম, ম প, ধ প, নি ধ, সা।
অবরোহ—সা, নি ধ, প, ম প ধ প, ম, গ ম রে সা।
পকড়— সা, ম, ম প, ধ প ম, প ম রে সা।

৩। জাতি— আরোহে রে ও গ বর্জ্জিত এবং অবরোহে 'গ' দুর্ব্বল বলিয়া ঔড়ব—ষাড়ব।

৪। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং তীব্র ম প্রয়োগ করা হয়।

৫। বাদী— ম
সম্বাদী— সা } পূর্ব্ব রাগ। সময়— রাত্রি ১ম প্রহর।

৬। এই রাগে 'ম'কে আরোহে (কখনও কখনও অবরোহে) এবং শুদ্ধ মধ্যমকে আরোহে ও অবরোহে প্রয়োগ করা হয়। 'নি' আরোহে এবং 'গ' অবরোহে বক্র। কদাচিৎ কোমল নি বিবাদী স্বররূপে ব্যবহৃত হয়।

৭। আলাপ—সা, রে সা, নি ধ প ম, ম প নি ধ সা, সা ম, ম প, প ম, রে সা। সা ম, ম প, ধ প ম, সা নি ধ প, ম প ধ প, ম, সা রে সা, সা ধ নি প, ম প, ম, গ ম রে সা, সা রে সা ম। প প সা, সা রে সা, সা ম রে সা, সা ম রে সা, সা রে সা ম।

রাগ বিহাগ

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা গ, ম প, নি সা।

অবরোহ—সা, নি ধ প, ম গ, রে সা।

পকড়— নি সা, গ ম প, গ ম গ, রে সা।

৩। জাতি— ঔড়ব—সম্পূর্ণ।

৪। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং ম প্রয়োগ করা হয়।

৫। বাদী— গ
সম্বাদী—নি } পূর্ব্বরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।

৬। এই রাগে 'রে' ও 'ধ' আরোহে বর্জ্জিত এবং অবরোহে দুর্ব্বল। তীব্র ম, কদাচিৎ বিবাদীস্বর রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭। আলাপ—সা, সা নি, নি সা রে নি, গ নি, প নি, নি সা। নি সা গ, সা গ, প নি নি সা সা গ, ম গ, প ম গ ম গ সা। গ ম প নি, নি, সা, নি সা রে সা, নি সা গ ম প গ ম গ সা, নি প, গ ম নি প, গ ম প, গ ম গ, রে সা।

রাগ দেশ

১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ —সা, রে, ম প, নি সা।

অবরোহ— সা নি ধ প, ম গ, রে গ সা।

পকড়— রে, ম প, নি ধ প, প ধ প ম গ রে গ সা।

৩। জাতি— সম্পূর্ণ।

৪। এই রাগে ৭টি শুদ্ধ স্বর এবং কোমল নি প্রয়োগ করা হয়।

৫। বাদী— রে
সম্বাদী— প } পূর্ব্বরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।

কেহ কেহ বাদী 'প' এবং সম্বাদী 'রে' মানিয়া থাকেন।

৬। এই রাগে আরোহে নি শুদ্ধ এবং অবরোহে কোমল। অবরোহে 'রে' বক্র। তার সপ্তকে কদাচিৎ কোমল গ ব্যবহৃত হয়।

৭। আলাপ—সা, নি সা রে নি ধ প, ম প নি সা, রে ম গ রে, গ সা। রে ম প, ম গ রে, নি ধ প, ধ ম গ রে, প ম গ রে, ম গ রে, গ সা। ম প নি সা, সা রে গ সা, রে ম প ম গ রে, ম গ রে গ সা, নি সা রে রে সা নি ধ প, ম প সা নি ধ প, ম গ রে, গ সা।

রাগ তিলককামোদ

১। এই রাগ খমাজ ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে গ সা, রে ম প ধ ম প, সা।

অবরোহ—সা প ধ ম গ, সা রে গ, সা নি।

পকড়— প নি সা রে গ, সা, রে প ম গ, সা নি।

৩। জাতি— ষাড়ব—সম্পূর্ণ।

৪। এই রাগে সব স্বরই শুদ্ধ।

৫। বাদী— রে
সম্বাদী—প } পূর্ব্বরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।

৬। এই রাগে আরোহে গ ও ধ এবং অবরোহে গ বক্র।

৭। আলাপ—সা রে গ, সা, প় নি় সা রে ম গ সা নি়, রে প ম গ সা। রে রে ম প, ম গ রে, ধ ম গ রে, সাঁ প ধ ম গ রে, ম ম গ রে গ, সা রে গ সা। ম প, নি, নি সাঁ, প নি সাঁ রেঁ, পঁ মঁ গঁ রেঁ গঁ সাঁ, প সাঁ প ধ ম গ রে গ সা।

রাগ কালিংগড়া

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে গ ম, প ধ নি সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ প, ম গ রে সা।

পকড়— ধ প, গ ম গ, 'নি়, সা রে গ, ম

৩। জাতি— সম্পূর্ণ।

৪। রে এবং ধ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— ধ
সম্বাদী— গ } উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি শেষ প্রহর।

৬। এই রাগের প্রকৃতি চঞ্চল। ইহাতে রে ও ধ ভৈরব রাগের মত অতটা আন্দোলিত হইবে না। পরজ রাগের সহিত ইহার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে।

৭। আলাপ—সা, সা নি ধ, ধ প, ধ নি সা রে গ, ম গ রে সা।
গ ম প ধ, ধ পধ, নি ধ, সা নি ধ, প ধ ম প, গ ম গ,
ম গ রে সা, নি নি সা রে গ। গ ম প ধ নি সা, ধ নি সা,
ধ নি সা রে সা নি ধ প, ধ নি সা নি ধ প, ম প ধ প ম প, গ ম গ।

রাগ শ্রী

১। এই রাগ পূর্ব্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ সা রে রে, সা, রে, ম প, নি সা।
অবরোহ—সা, নি ধ, প, ম গ রে, গ রে, রে, সা।
পকড়— সা, রে রে, সা, প, ম গ রে, গ রে, রে, সা।

৩। জাতি— ঔড়ব—সম্পূর্ণ।

৪। রে, ধ কোমল এবং ম বাকী স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— রে }
সম্বাদী— প } পূর্ব্ব রাগ। সময়—সূর্য্যাস্তের সময়।

৬। এই রাগের প্রকৃতি গম্ভীর।

৭। আলাপ—সা, রে রে সা, রে ম প, ম গ রে, গ রে, রে সা।
নি সা, রে নি ধ প, ম প নি সা, রে প ম গ রে,
নি নি ধ প ম গ রে, রে সা। ম প ধ প, নি সা,
রে সা, গ রে সা, নি ধ প ম গ রে সা।

রাগ সোহনী

১। এই রাগ মারবা ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— সা গ, ম ধ নি সা।
অবরোহ— সা রে সা, নি ধ, গ, ম ধ, ম গ, রে সা।
পকড়— সা, নি ধ, নি ধ, গ, ম ধ নি সা।

৩। জাতি— ষাড়ব।

৪। রে কোমল, ম তীব্র এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— ধ
সম্বাদী— গ } উত্তরাঙ্গবাদী। সময়—রাত্রি শেষ প্রহর

৬। পূরিয়া রাগের সহিত অনেকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া কেহ কেহ এই রাগকে প্রাতঃকালীন পূরিয়া রাগ বলিয়া থাকেন। অবশ্য পূরিয়া রাগের প্রকৃতি গম্ভীর এবং উহা সায়ংকালীন রাগ কিন্তু সোহনী চঞ্চল প্রকৃতির রাগ এবং উহা উষাকালে গেয়। কদাচিৎ শুদ্ধ মধ্যমকে এই রাগে বিবাদী স্বর রূপে প্রয়োগ করা হয়।

৭। আলাপ— সা, নি সা, রে সা, নি ধ, গ, ম ধ সা। নি সা গ,
ম গ, ম ধ নি সা নি ধ ম-গ, রে রে সা, নি ধ, ম ধ
সা নি ধ, ম গ রে সা। ম গ ম ধ ম সা, রে সা,
গ ম-গ রে সা নি ধ, ম ধ সা নি ধ, ম ধ ম গ রে সা।

রাগ বাগেশ্রী

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— সা, নি ধ নি সা, ম গ, ম ধ নি সা।

অবরোহ— সা, নি ধ, ম গ, ম গ রে সা।

পকড়— সা, নি ধ, সা, ম ধ নি ধ ম, গ রে, সা।

৩। জাতি ঃ—ষাড়ব—সম্পূর্ণ।

৪। গ ও নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— ম
সম্বাদী— সা } উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি ১২—৩টা।

৬। আলাপ— সা, সা নি ধ নি সা, সা রে সা, নি ধ ম নি ধ সা।

নি ধ নি সা, ম গ ম, ম ধ ম, নি ধ সা ম, ম ধ নি ধ ম,

ম গ রে সা, নি ধ সা। গ ম ধ নি সা, ম নি ধ সা,

ম গ রে সা, নি ধ সা নি ধ ম গ রে সা।

রাগ বিন্দ্রাবনী সারঙ্গ

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— নি সা, রে, ম প, নি সা।

অবরোহ— সা নি প, ম রে, সা।

পকড়— নি সা রে, ম রে, প ম রে, সা।

৩। জাতি— ঔড়ব।

৪। অবরোহে নি কোমল ইহা ছাড়া আরোহ এবং অবরোহের অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— রে
সম্বাদী— প } পূর্ব্বরাগ। সময়— দিবা ১২—৩ টা।

৬। আলাপ—

সা, নি সা রে, নি সা, নি প, ম প নি, সা। নি সা রে, ম রে,

প, ম প ম রে, রে ম প ম রে, সা রে, নি সা রে, নি সা।

ম প নি প ম রে, সা রে নি সা নি প ম রে, সা রে, নি সা রে

সা। ম প নি সা, রে ম রে সা, রে ম প ম রে সা,

নি সা রে সা, নি নি প ম রে সা।

রাগ ভীমপলাশী

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— নি সা গ ম, প, নি সা।

অবরোহ— সা নি ধ প ম, গ রে সা।

পকড়— নি সা ম, ম গ, প ম, গ, ম গ রে সা।

৩। জাতি—ঔড়ব—সম্পূর্ণ।

৪। গ ও নি কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— ম
সম্বাদী— সা } পূর্ব্বরাগ। সময়—দিবা ১২—৩ টা।

৬। আলাপ— সা, নি সা, রে রে সা নি সা, প নি সা, ম গ রে সা।
নি সা গ রে সা, নি সা নি ধ প, ম প নি, প নি সা।
নি সা, ম গ, প ম গ ম, নি ধ প ম প গ ম, নি সা
নি ধ প ম প, গ ম গ রে সা। ম প নি, প নি সা,
নি সা ম গ রে সা, নি সা গ রে সা, নি সা, নি সা রে,
সা রে সা, নি সা নি, ধ প, ম গ, প ম গ,
ম গ রে সা, রে নি সা ম।

রাগ পীলু

১। এই রাগ কাফী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— নি সা, গ রে গ, ম প, ধ প, নি ধ প, র্সা।

অবরোহ— র্সা, নি ধ প ম গ, নি সা।

পকড়— নি সা গ নি সা, প ধ নি সা।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। এই রাগে শুদ্ধ এবং বিকৃত বারটি স্বরই প্রয়োগ করা হয়।

৫। বাদী— গ, সম্বাদী— নি } পূর্ব্বরাগ। সময়—দিবা ১২—৩ টা।

৬। পীলু একটি সঙ্কীর্ণ রাগ। তানসেনের বংশধর রামপুরের উজীর খাঁ এবং ছম্মন সাহেবের মতে পীলু দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সঙ্গীত গ্রন্থোক্ত ধেনুকা নামক ঠাট (ধেনুকা ঠাট—'সা রে গ ম প ধ নি র্সা') হইতে উৎপন্ন। এই রাগে ভৈরবী এবং ভীমপলাশী রাগের সংমিশ্রন খুবই কুশলতাপূর্ণ।

৭। আলাপ—

নি সা গ, নি সা, সা রে সা নি ধ প, প ধ নি সা।

নি সা গ ম প, ধ প, নি ধ প, গ ম ধ প, গ নি সা।

গ ম প ধ প, র্সা, প, ধ প, নি ধ প, গ ম নি প গ, সা রে নি সা,

প ধ নি সা।

রাগ জৌনপুরী

১। এই রাগ আসাবরী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা, রে ম, প, ধ, নি র্সা।

অবরোহ—র্সা, নি ধ, প, ম গ, রে সা।

পকড়— ম প, নি ধ প, ধ, ম প গ, রে ম প।

৩। জাতি—ষাড়ব-সম্পূর্ণ।

৪। গ̲, ধ̲ ও নি̲ কোমল এবং অন্যান্য স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী— ধ̲ ; সম্বাদী— গ̲ } উত্তর রাগ। সময়—দিবা ২য় প্রহর।

৬। আলাপ—সা, রে সা, রে নি̲̣ ধ̲̣ প̣, ম̣ প̣ ধ̲̣ নি̲̣ সা। রে ম,
রে ম প, ম প গ̲, রে ম প, ধ̲ ম প, ম প ম ধ̲ ম নি̲
ধ̲ প, ধ̲ ম প গ̲, রে ম প। ম প ধ̲, নি̲ ধ̲, সা̇ নি̲ ধ̲,
নি̲ ধ̲ ম প ধ̲ গ̲, রে ম প। ম প ধ̲, নি̲ সা̇, নি̲ সা̇
গ̲̇ রে̇ সা̇, নি̲ সা̇ রে̇ ম̇ প̇ গ̲̇ রে̇ সা̇, নি̲ সা̇ রে̇ সা̇ নি̲
সা̇ নি̲ ধ̲ প, ম প ধ̲ নি̲ সা̇, গ̲ রে সা, রে ম প।

রাগ মালকৌঁস

১। এই রাগ ভৈরবী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ— নি̲̣ সা, গ̲ ম, ধ̲, নি̲ সা̇।

অবরোহ—সা̇ নি̲ ধ̲, ম, গ̲ ম গ̲ সা।

পকড়— ম গ̲, ম ধ̲ নি̲ ধ̲, ম, গ̲, সা।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। গ̲, ম, ধ̲ এবং নি̲ কোমল।

৫। বাদী— ম ; সম্বাদী—সা } উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি ১২—৩টা।

৬। মালকৌঁস গম্ভীর প্রকৃতির এবং জনপ্রিয় রাগ। রে, প বর্জ্জিত।

৭। আলাপ—সা, নি ধ নি সা, গ সা, নি ধ ম নি ধ নি সা।

সা ম গ ম, ম গ ধ ম, নি ধ ম ম, নি ধ ম, গ ম,

গ সা। ম গ ম ধ নি, ধ নি, নি সাঁ, সাঁ নি ধ নি সাঁ,

মঁ গঁ মঁ গঁ সাঁ, সাঁ নি সাঁ, নি সাঁ নি ধ নি ধ, ম ধ ম

গ ম গ সা, সা নি ধ নি সা ম।

রাগ মুলতানী

১। এ রাগ টোড়ী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—নি সা, গ ম প, নি সাঁ।

অবরোহ—সাঁ নি ধ প, ম গ, রে সা।

পকড়—নি সা, ম গ, প গ, রে সা।

৩। জাতি—ঔড়ব-সম্পূর্ণ।

৪। রে, গ ধ কোমল এবং ম তীব্র।

৫। বাদী—প
সম্বাদী—সা } পূর্ব্ব রাগ। সময়—দিবা ৩—৬টা।

৬। এই রাগে আরোহে রে, এবং ধ বর্জ্জিত। অবরোহে সম্পূর্ণ। এই রাগে রে, ধ, গ, কুশলতার সহিত প্রয়োগ করিতে হয়। কারণ এই তিন স্বরের ভুল প্রয়োগে টোড়ী রাগের ছায়া আসিয়া পড়ে। ইহাকে পরমেল-প্রবেশক রাগ বলে।

৭। আলাপ :—

নি সা গ ম প, ম গ, ম গ রে সা।

নি সা গ রে সা, নি সা ম গ ম প, ধ প ম প

ম গ, ম গ রে সা, নি সা গ রে সা।

গ ম প নি সাং, ম প নি সাং, নি ধ প,

ম প ধ প, ম প ম গ, ম গ রে সা।

নি সা গ রে সা।

রাগ জোগীয়া

১। এই রাগ ভৈরব ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে ম প ধ সাং।

অবরোহ—সাং নি ধ প, ধ, ম, রে সা।

পকড়—রে ম প ধ ম, রে ম রে সা।

৩। জাতি—ঔড়ব-ষাড়ব।

৪। রে, ধ কোমল, বাকী স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } উত্তর রাগ। সময়—রাত্রি শেষ প্রহর ৩—৬টা

৬। আরোহে নি বর্জ্জিত। প নি ধ প, এইভাবে কোমল নি কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়।

৭। আলাপ—

সা রে ম প ম রে ম রে সা, ধ রে সা

রে ম রে সা। রে ম প ধ ম প ম রে ম রে সা।

সা রে ম প ধ প ধ ম প ম রে, ম ধ ম রে, ম রে সা

ধ রে সা। সা রে ম প ম রে ম প ম

রে ম প ধ ম, রে ম প নি ধ প ধ ম,

প ম রে ম, ধ ম রে প, রে ম প ধ সা

ম প ধ সা, রে সা ধ সা রে ম রে সা।

সা নি ধ প ধ নি ধ প ধ ম প ম প ম রে সা,

রে ম, রে সা।

রাগ দূর্গা

১। এই রাগ বিলাবল ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—সা রে ম প ধ সা।

অবরোহ—সা ধ প ম রে সা।

পকড়—প, ম প ধ, ম রে, সা রে, ধ সা।

৩। জাতি—ঔড়ব।

৪। গ, নি বর্জ্জিত এবং বাকী স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী—ম
সম্বাদী—সা } পূর্ব্বরাগ। সময়—রাত্রি ২য় প্রহর।

৬। খমাজ ঠাট হইতেও অন্য এক প্রকার দূর্গা রাগ উৎপন্ন হইয়াছে কিন্তু বিলাবল ঠাটের দূর্গা রাগই অধিক প্রচলিত।

৭। আলাপ—

সা ম রে প, ধ ম প ধ ম, রে প ম, রে সা ধ সা।

রে সা ধ ম প ধ সা, রে ম রে সা। রে ম প ধ ম রে

প ম, রে ধ সা, সা রে ম প ধ ম, রে ম

প ধ ম, রে প ম, রে ম রে সা।

ধ সা, রে ম প ধ ম রে সা ধ সা।

ম প ধ সা সা, রে সা ধ ম, প ধ ম, প ম রে

ম প ধ রেঁ ধ সাঁ ধ ম, রে সা ধ সা।

সা রে ম প ধ সাঁ, সাঁ রেঁ সাঁ মঁ রেঁ সাঁ, ধ ম প ধ ম প
ম রে প ম রে সা ধ সা।

রাগ পূরিয়াধনাশ্রী

১। এই রাগ পূর্বী ঠাট হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

২। আরোহ—নি রে গ ম প, ধ প, নি সাঁ।

অবরোহ—রেঁ নি ধ প, ম গ, ম রে গ, রে সা।

পকড়—নি রে গ, ম প, ধ প, ম গ, ম রে গ, ধ ম গ, রে সা।

৩। জাতি—সম্পূর্ণ।

৪। রে, ধ কোমল, ম তীব্র, বাকী স্বর শুদ্ধ।

৫। বাদী—প
সম্বাদী—রে } পূর্বরাগ। সময়—সায়ংকাল।

৬। পূর্বী রাগের সহিত এই রাগের সামঞ্জস্য খুব বেশী। পূর্বী রাগে উভয় মধ্যম ব্যবহৃত হয় কিন্তু 'পূরিয়াধনাশ্রী'তে কেবল মাত্র তীব্র মধ্যমই ব্যবহার করা হয়। ম রে গ এবং রেঁ নি ধ প এই স্বর সমন্বয় এই রাগের স্বরূপ প্রকাশ করে।

৭। আলাপ—

নি রে গ ম রে গ, রে সা,
নি রে সা ম রে গ প, ম ধ প, ম গ ম রে গ প,
ম গ ম রে গ রে সা, নি রে সা।

ম ধ সাঁ, নি রেঁ সাঁ, নি রেঁ নি ধ নি ধ প,
ম ধ নি ম ধ প, ম গ ম রে গ রে সা নি রে সা।

পঞ্চম অধ্যায়

বাদ্য-যন্ত্র পরিচিতি

গীত, বাদ্য ও নৃত্য এই তিনটিই সঙ্গীতের এক একটি প্রধান অঙ্গ; সুতরাং ভারতীয় সঙ্গীতের ক্ষেত্রে বাদ্যের একটি বিশিষ্ট স্থান রহিয়াছে। বাদ্যযন্ত্র মধ্যে কতকগুলিকে আশ্রয় করিয়া আছে সুর—যে যন্ত্রগুলি পাকা ওস্তাদের হাতে পড়িয়া সুরের সুরলোক সৃষ্টি করিতে সক্ষম। আর কতকগুলি যন্ত্রকে আশ্রয় করিয়া আছে তাল—যে যন্ত্রগুলি গুণী বাদকের হাতে পড়িলে কণ্ঠ বা যন্ত্র সঙ্গীতকে করে সুন্দর ও সম্পূর্ণ। যন্ত্রসঙ্গীত ভারতীয় সঙ্গীত শাস্ত্রের মতে চারিটি পর্য্যায়ে পড়ে এবং সেই যন্ত্রসমুদয়ের নাম যথাক্রমে তত, শুষির, আনদ্ধ ও ঘন। যে সকল বাদ্যযন্ত্রে রৌপ্য, পিতল অথবা ষ্টীলের তার ব্যবহার করতঃ বাজানো হয় তাহাদিগকে বলা হয় তত-যন্ত্র—যথা বীণা, সেতার, সুরবাহার, সরোদ প্রভৃতি। যে সকল যন্ত্র বাঁশ কাঠ বা অন্য প্রকার ধাতব পদার্থ হইতে প্রস্তুত হয় এবং যাহাদিগকে মুখে ফু' দিয়া বাজাইতে হয় তাহাদিগকে বলা হইয়া থাকে শুষির—যথা বাঁশী, সানাই প্রভৃতি। যে সকল যন্ত্রের মুখে চর্ম্মাচ্ছাদন থাকে তাহাদিগকে অবনদ্ধ বা আনদ্ধ বলা হয়—যথা মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ঢোলক প্রভৃতি। আর যে সমস্ত বাদ্যযন্ত্র পিতল, কাঁসা প্রভৃতি ধাতু হইতে প্রস্তুত করা হয় এবং গীত, বাদ্য ও নৃত্য কালে তাল দিবার জন্য ব্যবহার করা হয় তাহাদিগকে বলা হয় ঘনযন্ত্র—যথা মন্দিরা, করতাল প্রভৃতি।

এখন দেখা যাইতেছে যন্ত্রসঙ্গীতের মধ্যে কতকগুলি সুর-যন্ত্র—যথা বীণা, সেতার, সুরবাহার, সরোদ, তম্বুর, সারঙ্গী, এস্রাজ, বেহালা, একতারা দোতারা, গোপীযন্ত্র, বাঁশী, সানাই প্রভৃতি আর কতকগুলি তাল যন্ত্র—যথা পাখোয়াজ, শ্রীখোল, তবলাবাঁয়া, ঢোলক, ঢোল, ঢাক, খঞ্জনী, করতাল ও মন্দিরা প্রভৃতি।

নিম্নে উল্লিখিত বাদ্যযন্ত্র সমুদয় মধ্যে বিশেষভাবে জনপ্রিয় কতকগুলি ভারতীয় ও পাশ্চাত্য সুর-যন্ত্রের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইল ঃ—

১। **বীণা** ঃ—ভারতের তার যন্ত্রসমূহ মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট বলিয়া স্মরণাতীত কাল হইতে গণ্য হইয়া আসিতেছে। ভারতীয় সংগীতের রাগরাগিণী সমূহ নিখুঁত ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া পরিবেশন করিতে এই যন্ত্র অদ্বিতীয়। ইহাকে বীণ ও বলা হইয়া থাকে। এই যন্ত্রের জন্য ভারতে তিনটি স্থান বিখ্যাত। দক্ষিন ভারতের তাঞ্জোর এবং মহীশূর এবং পশ্চিম ভারতে মীরাজ। তাঞ্জোরের বীণা কাঁঠাল কাঠে (Jack wood) এবং মহীশূরের বীণা কৃষ্ণ কাঠে (Black wood) তৈরী হইয়া থাকে। তাঞ্জোরের সমস্ত বীণাই গজদন্তের কারুকার্য্য খচিত হইয়া থাকে। একটী মাত্র কাষ্ঠখণ্ড কুঁদিয়া বীণার তবলীর খোলটী প্রস্তুত হয়। এই তবলীর চেপ্‌টা অগ্রভাগ প্রস্থে এক ফুট হইয়া থাকে এবং ইহার নিকটে থাকে অনেকগুলি সরু স্বরছিদ্র। ইহার সওয়ারীর গড়নটীও অনন্যসাধারণ। পার্শ্ববর্ত্তী তার সমূহের জন্য তবলীর উপরস্থিত প্রধান সওয়ারীর যোগে একটী ধাতুনির্ম্মিত স্বতন্ত্র সওয়ারী রহিয়াছে। যন্ত্রের তব্‌লী ও দণ্ড একই কাঠে তৈরী হইয়া থাকে। যন্ত্রের গ্রীবাদেশ সাধারণতঃ বক্র হয় ও তাহাকে খোদাই করা ময়ূর বা অন্য কোনও মূর্ত্তি দ্বারা সুশোভন করা হয়। যন্ত্র-দণ্ডটীও কুঁদিতই থাকে। গ্রীবার পশ্চাতে অল্প নিম্নাংশে একটী ছোট লাউয়ের খোল বসান হয় সেইটি বীণার স্বর-বর্দ্ধক। এই খোলটী ইচ্ছামত লাগানো এবং সরানো যায়। যন্ত্রের পর্দ্দাসমূহ পিতল কিম্বা রৌপ্য নির্ম্মিত হয়। এই পর্দ্দাগুলি যন্ত্রকাণ্ডের দুই পার্শ্বে দুই সারিতে মোম জাতীয় কোন পদার্থ দ্বারা আটকানো থাকে। সে পদার্থটী ঈষৎ তাপেই নরম হয় এবং বাদক ইচ্ছানুরুপ পর্দ্দার স্থান পরিবর্ত্তন করিতে পারেন। মোট চব্বিশটী পর্দ্দা থাকে—সুতরাং প্রত্যেক তারে সম্পূর্ণ দুইটী সপ্তক পাওয়া যায়। বীণাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটী তার এবং প্রধান বা মূল পর্দ্দাসমূহের কান যন্ত্রের গ্রীবার প্রতিপার্শ্বে দুইটি করিয়া থাকে। তারগুলি গজদন্তের

সওয়ারীর উপর দিয়া যন্ত্রের কাণ্ড হইতে গ্রীবাদেশ পর্য্যন্ত লম্বিত থাকে। পাশের তিনটী তারের কান লাউয়ের খোলের উপরে দণ্ডপার্শ্বে আটকানো থাকে। বীণার সাতটী তারের মধ্যে চারটি প্রধান তার পর্দ্দার উপর দিয়া লম্বিত এবং বাকি তিনটী ঝালার তার দণ্ডের এক পার্শ্বে থাকে। বাদকের সন্নিকটবর্ত্তী দুইটী সূক্ষ্ম তার ষ্টীলের এবং অপর দুইটী প্রধান তার পিতলের কিম্বা রূপার হইয়া থাকে। সূক্ষ্মতম তারটি হইতে আরম্ভ করিয়া ইহাদের নাম যথা ঃ—সারণী, পঞ্চম, মন্দারণ, অনুমন্দারণ। পার্শ্বের তিনটী তারের নাম পাক্কা সারণী বা চিকারী। যন্ত্রটীর সুর বাঁধিবার নানা প্রকার প্রণালী আছে—তন্মধ্যে সাধারণতঃ সর্ব্ববাদিসম্মত মতটি এরূপ ঃ—

	মূল বা প্রধান তার	পাশের তার
(ক)	সা প সা সা	প সা প
(খ)	প সা প প	সা প সা
(গ)	ম সা প সা	সা সা প

প্রথম দুইটী তারই সর্ব্বাধিক বাজানো হয় যদিও নিপুণ বাদক অবলীলাক্রমে সবগুলি তারই বাজাইয়া থাকেন।

বাদকের দুই-জানুর উপর সমান্তরাল ভাবে পাতিয়া অথবা স্কন্ধে হেলান দেওয়াইয়া বীণা যন্ত্রটী বাজানো হয়। ভিন্ন ভিন্ন বাদকের ভিন্ন ভিন্ন বাদন রীতি বা ষ্টাইল দেখা যায়। অঙ্গুলিতে মেজ্রাব্ পরিয়া অথবা অঙ্গুলির নখ দ্বারা বীণা বাজানো হয়। যন্ত্রের প্রধান তারগুলি প্রথম তিনটী অঙ্গুলি দ্বারা ও চিকারীর তার রাগের লয় অনুযায়ী সময় সময় আঘাতক্রমে চতুর্থ অঙ্গুলি দ্বারা বাজানো হয়। প্রধান তারগুলি পর্দায় নিবদ্ধ, পরন্তু পার্শ্বের তারগুলি সব সময়ই খোলা। গঠন প্রণালী বাদনরীতি ও অপূর্ব্ব সুরসৃষ্টির কার্য্যকারিতা বিচার করিলে বীণাকে একটী আদর্শ বাদ্যযন্ত্র বলিতে হয়, পরন্তু বীণা বাদন করেন বলিয়াই দেবী স্বরস্বতী বীণাপাণি রূপে পরিকল্পিতা। পুরাণে উক্ত আছে দেবর্ষি নারদ বীণা বাজাইয়া হরিগুণগান করিতেন—শ্রীরামচন্দ্রের দুই পুত্র লব

ও কুশ বীণা সহযোগে রামায়ণ গান করিতেন রামায়ণে এরূপ উল্লিখিত আছে। যে ভাবেই বিচার করা যাক না কেন বীণা যে ভারতীয় তার যন্ত্রের মধ্যে সর্ব্বাধিক প্রাচীন ও শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা সম্পন্ন আদর্শ তার যন্ত্র এ বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। বীণার অনেক নাম দেখিতে পাওয়া যায় যথা ঃ—

মহতী বীণা (নারদ কর্ত্তৃক সৃষ্ট ও বাদিত)
কচ্ছপী বীণা (দেবী স্বরস্বতীর বাদ্য যন্ত্র)
ত্রিতন্ত্রী বীণা, কিন্নরী বীণা, রঞ্জণী বীণা, রুদ্রবীণা, নারদীয় বীণা, কাত্যায়ন বীণা, প্রসারণী বীণা, পিনাকী বীণা ও ময়ূর বীণা ইত্যাদি।

২। **বীণ** ঃ—দু'হাত দীর্ঘ একটী বংশদণ্ড। দণ্ডের এক পৃষ্ঠের দুই পার্শ্বে দুইটী লাউয়ের খোল, অপর পৃষ্ঠে ১৯ হইতে ২২ সংখ্যক ঘাট (সারিকা) আছে। সাধারণতঃ অর্দ্ধ হস্ত অন্তর অন্তর প্রায় দেড়হাত স্থান জুড়িয়া স্বরস্থান। সওয়ারী এখানে তন্দ্রাসন। তন্দ্রাসনের উপর দিয়া তিনটী ষ্টীলের তার ও চারটী পিতলের তার দণ্ডশীর্ষের সাতটী কান পর্য্যন্ত গিয়াছে। তারগুলি ক্রমানুসারে সা়, গ়, প়, সা, ম, র্সা, র্সা হয়। বাইরের প্রথম সা দণ্ডের পার্শ্বে থাকে ও চিকারীর কাজ করে। ইহা একটী সুপ্রাচীন যন্ত্র। পরবর্ত্তী কালের রবাব, সেতার, সুরবাহার, সুরশৃঙ্গার প্রভৃতি তার যন্ত্র বিভিন্ন প্রকার বীণা হইতেই আসিয়াছে যথা রুদ্রবীণ হইতে রবাব, চিত্রা হইতে সেতার, কচ্ছপী হইতে সুরবাহার ইত্যাদি।

৩। **তম্বুর**—(তানপুরা) ঃ—সারা ভারতের সর্ব্বাধিক ব্যবহৃত খোলা তারের যন্ত্র। কাঁঠাল, তূঁত্ বা সেগুণাদি কাঠে যন্ত্রটী তৈরী হইয়া থাকে। ইহাতে কাঠের দণ্ড, কাঠের পটরী ও কাঠের চারটী কান থাকে। দণ্ডের নিম্নভাগে কাঠের অথবা মাঝারি বা বৃহৎ সুগোল লাউয়ের খোল ও তদুপরি কাঠের তব্‌লী এবং তব্‌লীর কেন্দ্রস্থলে কাষ্ঠ বা গজদন্তের অথবা মৃগশৃঙ্গের তৈরী সওয়ারী বসান। চারটি তার, দুইটি পিতলের ও দুইটি ষ্টীলের অথবা একটী পিতলের ও তিনটী ষ্টীলের। তারগুলি যন্ত্রমূল হইতে

প্রধান সওয়ারীর উপর দিয়া উঠিয়া কানের নিম্নে বসান মৃগশৃঙ্গ, কাষ্ঠ বা গজদন্ত নির্ম্মিত বাঁকানো সছিদ্র সরুব্রিজের ভিতর দিয়া কান্ পর্য্যন্ত গিয়াছে। যন্ত্রের বাম দিক হইতে আরম্ভ করিয়া পর পর চারটী তারে এরূপ সুর বাঁধিতে হয় যথা ঃ—প্ সা সা সা় অর্থাৎ যন্ত্রের বাম দিকের প্রথম তারে পঞ্চম, (উদারা) মধ্যস্থলের দুইটিতে মুদারা সপ্তকের সা ও সর্ব্বশেষ তারে উদারা সপ্তকের সা হইবে। সওয়ারী এবং প্রতিটি তারের মধ্যে সিল্কের সূতার টুক্‌রা জুড়িয়া দিয়া সুরের জোয়ারী করিতে হয়। তাহাতে সুন্দর সুর-ঝঙ্কারের সৃষ্টি হয়।

কণ্ঠসংগীতে সহযোগিতার ক্ষেত্রে তম্বুরের দান অতুলনীয়—যন্ত্রের রাজ্যে এর জোড়া মিলেনা। লক্ষ্ণৌ, রামপুর, তাঞ্জোর, মীরাজ ও ইদানীং বাংলায় ও বম্বেতে উৎকৃষ্ট তম্বুর তৈরী হইয়া থাকে। তম্বুরের গাত্রে গজদন্তের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য করিয়া যন্ত্রটীকে সুন্দর ও মূল্যবান করা হইয়া থাকে। এ যন্ত্র রাজা হইতে দরিদ্রতম ব্যক্তির নিকট সমভাবে আদরণীয় এবং ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে ভারতে ইহার ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়।

৪। **সুরবাহার** ঃ—সুরবাহার দেখিতে বড় সেতারের ন্যায়। তুম্বাটী বড় এবং দণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে সেতার অপেক্ষা বড় হয়। ইহাতে তারের সন্নিবেশ কিছু অন্য ধরণের হইয়া থাকে কেননা ইহাতে গৎ বাজেনা—ইহা রাগালাপের জন্যই প্রশস্ত। ইহার নায়কী তার মধ্যম, সুরের তার মন্দ্র খরজ কিন্তু তৃতীয় তারটী অতি মন্দ্র পঞ্চম। তাহার পরের তার অতি মন্দ্র গান্ধার বা মধ্যম (রাগ অনুযায়ী)। পরের তিনটী ঝংকারের তার--একটী রাগ অনুযায়ী বাঁধা হয় ও শেষের ২টী চিকারীর তার (মুদারা ও তারার সা সুরে বাঁধা)। আলাপের যন্ত্র বলিয়া ইহাতে মন্দ্রের কাজ বেশী হয় এবং তার সবগুলিই মোটা। তার ফলে সেতার অপেক্ষা মীড় ও গমকের কাজ বেশী হয়।

বীণাতে সুরের যে সকল কাজ হয় তার অধিকাংশই সুরবাহারে তোলা সম্ভব হয়। বিগত উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সুরবাহার যন্ত্রের সমাদর

বৃদ্ধি পায়, ইহার কারণ বীণকারগণ নিজের পুত্র ভিন্ন কাহাকেও বীণা শিক্ষা দিতে চাহিতেন না। পরন্তু ধনী শিষ্য অথবা উপযুক্ত শিষ্যদিগকে বীণার পরিবর্ত্তে সুরবাহার যন্ত্রেই বীণার তালিম দিতেন।

৫। **সেতার** ঃ—সেতারের প্রাচীন নাম 'সেহতার'। সেহতার একটি ফার্সি শব্দ। 'সেহ' অর্থাৎ তিন এবং 'তার' এই দুইটি কথার সংযোগে 'সেহতার' শব্দটি উৎপন্ন হইয়াছে। চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে আলাউদ্দীন খিলজীর দরবারের সুপ্রসিদ্ধ সঙ্গীতজ্ঞ, কবি এবং মন্ত্রী আমীর খুসরু সর্ব্বপ্রথম এই যন্ত্রটী আবিষ্কার করেন। আমীর খুসরুর আবিষ্কৃত সেতারে তিনটি প্রধান তার এবং ১৪টি পর্দ্দা ছিল। তার তিনটির প্রথমটি লোহার এবং ইহা মধ্যমে মিলান হইত। পরবর্ত্তী পিতলের তার দুইটিকে যথাক্রমে 'সা' এবং 'প'তে মিলান হইত। তৎকালেও দক্ষিণ হস্তের তর্জ্জনীতে মিজ্রাব্ পরিয়া সেতার বাজান হইত কিন্তু আজকালকার মত সেতার লইয়া বসিবার কোন ও বিধিবদ্ধ নিয়ম ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে মুহম্মদ শাহের দরবারের শাহ সদারঙ্গজী পূর্ব্ববর্ত্তী সেতারের তিনটি তারের স্থলে বীণার অনুকরণে ছয়টি তারের ব্যবহার প্রবর্ত্তন করেন। আধুনিক কালে দুই প্রকার সেতার প্রচলিত—সাদা এবং তরফদার। সাদা অর্থাৎ সাধারণ সেতারে ৭টি তার এবং তরফদার সেতারে অতিরিক্ত ৯টি, ১১টি কিংবা ১৫টি তার ব্যবহার করা হয়। আজকাল অধিকাংশ সেতারেই ১৬টি পর্দ্দা থাকে কেহ কেহ কয়েকটি অতিরিক্ত পর্দ্দাও ব্যবহার করিয়া থাকেন।

বর্ত্তমান ভারতে মুখ্যতঃ দুই প্রকার ঢঙে (Styleএ) সেতার বাজান হইয়া থাকে—(ক) দেহলীবাজ। (খ) লখ্নউই অথবা পূর্ব্বীবাজ।

(ক) দেহলীবাজের স্রষ্টা শাহ শদারঙ্গজী কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীতে অসাধারণ পারদর্শী ছিলেন। তিনি খেয়ালের ঢঙে সেতারের জন্য বিলম্বিত ও মধ্যলয়ের গৎ তৈরী করেন। তাঁহার প্রবর্ত্তিত গৎ 'দেহলী-বাজ্' তথা মসীদখানী গৎ নামে পরিচিত।

(খ) লখ্‌নউই অথবা পূর্ব্বীবাজ্‌—সুপ্রসিদ্ধ যন্ত্র শিল্পী গুলাম রজা পূর্ব্বীবাজ্‌-গতের স্রষ্টা। এই গৎ জলদ অর্থাৎ দ্রুতগতিতে বাজান হইয়া থাকে এবং গুলাম রজার নামে ইহা রজাখানী গৎ বলিয়া প্রসিদ্ধ।

সেতার মিলাইবার মোটামুটি নিয়ম ঃ—

সেতারের বাজ অথবা নায়কীর তার (ষ্টীল নির্মিত) মন্দ্র-সপ্তকের মধ্যমে মিলাইতে হয়। ইহার পরবর্ত্তী পিতলের তার দুইটিকে জোড়ীর তার বলে। উহাদিগকে মন্দ্রসপ্তকের ষড়জে (সুরে) মিলাইতে হয়। জোড়ীর তারের পরবর্ত্তী ষ্টীলের এবং পিতলের মোটা তার দুইটিকেই মন্দ্রসপ্তকের পঞ্চমে মিলাইতে হয়। তৎপরবর্ত্তী ষ্টীল-নির্ম্মিত তার দুইটির প্রথমটিকে মধ্যসপ্তকের সুরে এবং দ্বিতীয়টিকে মধ্যসপ্তকের পঞ্চম অথবা তার 'সা'তে মিলাইতে হয়।

সেতারের ভিন্ন ভিন্ন অংশ ঃ—

১। ডাণ্ড—সেতারের যে অংশে পর্দ্দা বাঁধা হয় তাহাকে ডাণ্ড বলে।

২। তুম্বা—ডাণ্ডের নীচেকার গোলাকৃতি অংশকে তুম্বা বলে। উহা সাধারণতঃ লাউ-নির্ম্মিত হয়।

৩। গুলু—ডাণ্ড এবং তুম্বার সংযোগ স্থলকে গুলু বলে।

৪। তবলী—তুম্বার উপরিভাগকে তবলী বলে।

৫। লঙ্গোট—তুম্বার নিম্নে যে অংশে তারের এক প্রান্ত বাঁধা হয় তাহাকে লঙ্গোট বলে।

৬। ঘুরচ—ঘুরচ অথবা ঘোড়ী (Bridge) হাড় নির্ম্মিত। উহা তবলীর উপরে অবস্থিত। সেতারের ৭টি তারই ঘুরচের উপর দিয়া খুঁটি পর্য্যন্ত প্রলম্বিত।

৭। জওয়ারী—ঘুরচের উপরিভাগকে জওয়ারী বলে।

৮। তার-গহন—তারগহন ও হাড়ের তৈরী। ইহা খুঁটির নিকটে থাকে, সেতারের ৭টি তারই ইহার ছিদ্রপথে অগ্রসর হইয়া খুঁটিতে পৌঁছায়।

৯। খুঁটি—তুম্বার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত ৭টি কাষ্ঠ নির্ম্মিত গোলাকৃতি অংশকে খুঁটি বলে। লঙ্গোটে তারের এক প্রান্ত বাঁধা হয় এবং খুঁটিতে তারের অপর প্রান্ত জড়ানো থাকে।

১০। পরদা—পরদা অথবা সুন্দরিয়া ডাণ্ডের সঙ্গে মুগা সূতা দিয়া বাঁধা থাকে। সেতারের সাধারণতঃ ১৬টি পরদা থাকে।

১১। মনকা—তবলীর উপরে 'বাজ্-কা তার' এর সঙ্গে একটি মতি লাগানো থাকে উহাকে মনকা বলে। মনকা 'বাজ্-কা-তার'টিকে যথাযথ ভাবে স্বরে মিলাইতে সাহায্য করে।

১২। মিজ্রাব্—মিজ্রাব্ অথবা নক্কী স্টীলের তার হইতে প্রস্তুত। উহাকে তর্জ্জনীতে পরিয়া সেতার বাজাইতে হয়। সেতারের এক প্রকার বোলকে ও মিজ্রাব্ বলা হয়। কোনও গতের সহিত "দার দার দির, দার দার দির, দার দার দির" এই বোলটিকে তিনবার ব্যবহার করিয়া গতের সোমে ফিরিয়া আসাকে মিজ্রাব্ বলে।

১৩। জম্‌জমা—সেতারে জোড়া জোড়া স্বর, পর পর দ্রুত গতিতে বাজাইলে উহাকে জমজমা বলে।
যথা—রেগ রেগ, গম গম, মপ মপ, পধ পধ ইত্যাদি।

১৪। জোড়—সেতারে আলাপ বাজানকে জোড় বলা হয়।

১৫। ঝালা—সেতারে 'বাজ-কা-তার' এবং তার 'সা' এর চিকারীর তারে দা রা রা রা, দা রা রা রা, দা রা রা রা, দা রা রা দা রা রা দারা—এই প্রকার বোল বাজনাকে ঝালা বলে।

১৬। তরবেঁ—সেতারের পরদার সংখ্যানুযায়ী ৭ তারের নীচে কতকগুলি তার লাগান হইয়া থাকে উহাদিগকে তরবেঁ-তার অথবা তরফের তার বলা হয়। তরবেঁ তার ভিন্ন ভিন্ন স্বরে মেলান হয় এবং ঐ তারগুলি হইতে উত্থিত ধ্বনি মূল তারের রচিত সুরকে অধিকতর মাধুর্য্যমণ্ডিত করে।

৬। **রবাব** :—আনুমানিক তিনশত বৎসরের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। রবাবের সহিত সরোদের আকৃতিগত সাদৃশ্য রহিয়াছে। ঐতিহাসিকদের মতে রবাবের চেহারা কিছুটা পরিবর্ত্তন করিয়াই সরোদের উৎপত্তি হইয়াছে। রবাবের দণ্ডটী একটী অখণ্ড কাঠের তৈরী এবং দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড়হাত লম্বা হয়। কেহ কেহ ইহাকে রুদ্রবীণ বলিয়া থাকেন, যদিও উহার দণ্ডটী তানপুরার ন্যায় দীর্ঘ হয়। খোলের উপরে চামড়ার তব্‌লী থাকে। দণ্ডের পটরীটী কাঠের এবং সওয়ারীটী সাধারণতঃ হাতীর দাঁতের হয়। এই যন্ত্রে কোন বাঁধা পর্দ্দা থাকেনা। ইহাতে ছয়টী কান ও ছয়টী তাঁতের তার থাকে। বাঁম হাতে মাছের অাঁস (শল্ক) দিয়া টানিয়া টানিয়া বাজানো হয়। ডান হাতে 'জওয়া' (নারিকেলের মালা অথবা ষ্টীলের মিজ্রাব্‌ জাতীয় তিন কোণা টুকরা) দ্বারা আঘাত করিয়া বাজানো হইয়া থাকে। 'জওয়ার' আঘাতে বাহিরের দিকে 'ডা' এবং ভিতরের দিকে 'রা' শব্দ বাহির হয়। তারগুলি ক্রম অনুসারে প, রে, ম, প, গ, এবং সা সুরে বাঁধা হয়।

৭। **সরোদ** :—বিগত দুইশত বৎসরের মধ্যে এই যন্ত্রটী আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে ইহাই মনে হয় আরব দেশ অথবা খোরাসান হইতে আফ্‌গানিস্থানের ভিতর দিয়া যন্ত্রটি ভারতে আসিয়াছে। এই যন্ত্রটীর নামকরণ সম্বন্ধে এইরূপ অনুমিত হয় যে আরবী শব্দ "শা + রুদ" হইতে সরোদ নামের সৃষ্টি হইয়াছে। আকৃতিগত সাদৃশ্যের নিমিত্ত সরোদকে খোরাসান অথবা আফ্‌গানিস্থানের রবাবেরই একটী নূতনতর সংস্করণ বলিয়া অনুমিত হয় এবং ইহাও দেখা যায় যে সরোদ বাদ্যের ঘরানা রবাবীদিগের শিষ্যগণ দ্বারাই প্রচলিত হইয়াছে। কাবুল ও কাশ্মীরে এই যন্ত্রটীর বহুল প্রচার হয় এবং উহাতে তারের পরিবর্ত্তে তাঁতই বেশী ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উত্তর ভারতে সাহাজাদ্ খাঁ, গোলামালী খাঁ ও অপরাপর কতিপয় ওস্তাদ কাশ্মীর ও কাবুল দেশীয় সরোদের আকৃতি কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করেন। ইহা দেড়হাত

লম্বা একটা কাঠকে কুঁদিয়া তৈরী করা হয়। তব্‌লীটী কাঠের, উপরিভাগ চামড়ায় আবৃত এবং দণ্ডের পটরীর উপর লোহার পাত লাগানো থাকে। ইহাতে ৬টী প্রধান তার ৬টী কানের সহিত যুক্ত থাকে। প্রাচীনকালে তাঁতের তার ব্যবহার করা হইত। বর্ত্তমানে লোহার তার ব্যবহার করা হয়। তারগুলি যথাক্রমে ম ও প (অতিমন্দ্র), প, সা, ম সুরে বাঁধিতে হয়। ৯টী হইতে ১৫টী তরফের তার থাকে। যন্ত্রটী "জওয়া" (নারিকেলের মালা, কাঠের বা বাঁশের ত্রিকোণাকার টুকরা) দিয়া বাজানো হয়। যন্ত্রীরা বজাইবার সময় বাম হস্তের চারিটী অঙ্গুলী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহাতে কোনও পর্দ্দা থাকেনা।

৮। **এস্রাজ**ঃ— কাঠের তৈরী। তব্‌লী চামড়ার এবং পটরী কাঠের, নিম্নাংশ অনেকটা সারিন্দার মত সারিকা বা ঘাট ১৬-১৯টী থাকে এবং ঘাটগুলি মূগা সুতায় দণ্ডের সহিত বাঁধা থাকে। মূল তার ৪টী এবং তরফের তার সাধারণতঃ ১৫টী থাকে। তারের সংখ্যানুযায়ী কান থাকে। দণ্ডের দৈর্ঘ্য সাধারণতঃ কিঞ্চিদধিক দুই হাত হইয়া থাকে। প্রধান ৪টী তার ম সা সা প অথবা ম সা প সা সুরে বাঁধা হয়। এই যন্ত্রটী অশ্বপুচ্ছের তৈরী ছড় দিয়া বাজানো হয়।

৯। **সারেঙ্গী**ঃ—সারেঙ্গী সম্পূর্ণ একটী কাষ্ঠখণ্ডের তৈরী। তব্‌লী চামড়ার। পটরী কাঠের। চারটী কান ও চারটী তার। তন্মদ্ধে তিনটী তার তাঁতের, চতুর্থটী তামা, পিতল বা ষ্টীলের হয়। তরফের তার ১৫-৩০টী। ইহাতে কোন বাঁধা পর্দ্দা থাকেনা। অশ্বপুচ্ছবদ্ধ একগাছি ধনুদ্বারা বাজানো হয়। বামহাতের অঙ্গুলীর অগ্রভাগের পিছন দিক দিয়া বাজাইবার রীতি। চারটী তার বাঁধিবার নিয়ম ম, সা, প়, সা়। গজল, কাওয়ালী, টপ্পা, ঠুংরী, খেয়াল ইত্যাদি গানের সহিত বিশেষভাবে এই যন্ত্রটী ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

১০। **বেহালা** ঃ—বেহালা একটি পাশ্চাত্য সঙ্গীত-যন্ত্র। আনুমানিক ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইউরোপে এই যন্ত্রটী সর্ব্বপ্রথম আবিষ্কৃত হয়। কাহারো কাহারো মতে ইউরোপে তৎকালে প্রচলিত 'ভায়োল' নামক ছয় তার বিশিষ্ট যন্ত্রের অনুকরণে এই যন্ত্রটী নির্ম্মিত হয়। প্রাচীন ভারতে বহুল প্রচলিত তিন তার বিশিষ্ট 'রবাব' যন্ত্রের সহিত ও বেহালার যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। ইউরোপে ইটালীতেই এই যন্ত্রটী সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রচলিত ছিল। বর্ত্তমানে পৃথিবীর সকল দেশেই ইহার প্রচলন দেখা যায়।

বেহালার বিভিন্ন অংশ ঃ—

১। বেলী (Belly)—ধ্বনির অনুরণনে সাহায্যকারী বেহালার মধ্যবর্ত্তী মুখ্য অংশকে বেলী বলে।

২। রিবস্ (Ribs)—বেলীর চারদিকের অংশগুলিকে রিবস্ অথবা সাইডস্ (sides) বলে।

৩। নেক (Neck)—বেলীর সহিত সংলগ্ন বেহালার যে অংশে খুঁটী থাকে উহাকে 'নেক' বলে।

৪। হেড (Head or scroll)—বেহালার খুঁটির দিকের প্রান্তভাগকে হেড অথবা স্ক্রল বলে।

৫। পেগস্ (Pegs)—বেহালার খুঁটীকে পেগ্ বলা হয়।

৬। নাট (Nut)—'পেগস্'এর নীচের অংশকে নাট বলে।

৭। ফিঙ্গার বোর্ড (Finger board)—বেহালার যে অংশে আঙ্গুল রাখিয়া বাজান হয় উহাকে 'ফিঙ্গার বোর্ড' বলে।

৮। ব্রিজ (Bridge)—বেহালার যে অংশের উপর দিয়া তার 'পেগস্' এ পৌঁছায় তাহাকে ব্রিজ বলে।

৯। টেল-পীস (Tail-Piece)—বেহালার হেডের ঠিক বিপরীত অংশ—এই অংশে ৪টি তারের এক প্রান্ত বাঁধা থাকে।

বডিটীও অধিকাংশ ক্ল্যারিনেটেই দুইটী অংশে বিভক্ত। মাউথ পিসের উপরের দিক চোখা, নীচে লম্বা গর্ত্ত। ইহার পিছনে পাতলা বেতের অথবা 'সর' জাতীয় গাছের সারাংশ হইতে প্রস্তুত বিলাতী রিড্ (Reed) লাগাইয়া বাজাইতে হয়। 'লিগেচার' (Ligature) নামক জার্ম্মান সিলভার দ্বারা প্রস্তুত একটী পদার্থ দ্বারা রিড্টী মাউথ পিসের সঙ্গে আটকান থাকে। রিড্ ও মাউথপিসকে সুরক্ষিত রাখার জন্য উভয়কে একটী 'মাউথ্ক্যাপ্' (Mouth cap) দ্বারা ঢাকিয়া রাখা হয়। সাধারণভাবে প্রচলিত ক্ল্যারিওনেট গুলিতে ১৪টী চাবি থাকে।

বিভিন্ন স্কেলের ক্ল্যারিওনেট পাওয়া যায়। তবে B ও A স্কেলের ক্ল্যারিওনেটের প্রচলনই সর্ব্বাধিক।

১৫। **ব্যাগপাইপ** :—ইহা দেখিতে একটি চামড়া অথবা কাপড়ের তৈরী ব্যাগের মত এবং ইহার ভিতরে হাওয়া পুরিবার জন্য একটী প্রধান নল বা পাইপ লাগানো থাকে। ব্যাগের চারিপাশে ২টী হইতে ৫টী পর্য্যন্ত বাঁশীর ন্যায় নল লাগানো থাকে। প্রধান নলটীর মধ্যে কয়েকটী ছিদ্র থাকে, যাহার সাহায্যে নানা সুর বাজানো হয়। অন্যান্য বাঁশীগুলির ভিতর হইতে এক একটী করিয়া স্বর (খরজ অথবা পঞ্চম) বাহির হয়।

১৬। **হাওয়াইয়ান্ গীটার** (Hawaiian Guitar) ইহা একটি পাশ্চাত্য তার-যন্ত্র। স্প্যানিশ গীটার হইতে ইহার উৎপত্তি। হাওয়াই দ্বীপেই ইহার প্রথম প্রচলন হয় বলিয়াই ইহার উপরোক্ত নামকরণ হইয়াছে। বর্ত্তমানে প্রায় সকল দেশেই ইহার প্রচলন হইয়াছে। এই যন্ত্রটির গড়ন যেরূপ সুন্দর ইহার বাজনাও ততোধিক মধুর ও প্রাণস্পর্শী। সাধারণতঃ গীটারের ৬টী তার হয় (৭ বা ৮ তারের গীটারও আছে তবে তাহা প্রয়োজন বোধে ইলেক্ট্রিক্ গীটারেই হইয়া থাকে)। অন্যান্য যন্ত্রের ন্যায় ইহারও Position marks-সহ fret-board আছে। হাওয়াইয়ান গীটারে সাধারণতঃ ১৮ হইতে ২০টি এবং ইলেকট্রিক গীটারে ২৮ হইতে ৩০টি fret হইয়া থাকে। এই যন্ত্রে করুণ সুরের রূপই ভাল লাগে। ইহার ৬টী তারের ১ম, ২য়,

৩য় এই তিনটি (Plain) তারকে Treble এবং ৪র্থ, ৫ম ও ৬ষ্ঠ এই তিনটি (Coiled) তারকে Bass strings বলা হয়, এবং ৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১ এই ৬টী তারকে যথাক্রমে :—

৬ ৫ ৪ ৩ ২ ১
১। গ সা প সা গ প অথবা
২। সা প সা গ প সা—এই দুই প্রকার সুরেই বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে বাঁধা হইয়া থাকে।

বাজাইবার নিয়ম :—

প্রয়োজন মত নীচু হাতলবিহীন চেয়ারে দক্ষিণ হাটুতে Body ও বাম হাটুতে Neck (fret-board-এর তলা) সমানভাবে রাখিয়া যাহাতে বাজাইবার সময় কোন প্রকার অসুবিধা না হয় এইরূপ ভাবে বসিয়া বাম হস্তে গোল ষ্টীলের "Bar" ও দক্ষিণ হস্তের ৩টী আঙ্গুলে "Pick" পরিয়া বাজাইতে হয়।

১৭। **সানাই**:— কাহারো মতে সানাই শব্দটী—"শাহ+নাই" হইতে আসিয়াছে। শাহ অর্থাৎ বাদশাহের একমাত্র অধিকারেই এই যন্ত্রটী ছিল বলিয়া 'শাহ' কথাটীর মর্য্যাদা দেওয়া হইয়াছে। প্রকৃত প্রস্তাবে এই যন্ত্রটীর নাম ছিল 'নাই', শাহের অনুমতি ব্যতীত এই যন্ত্রটী বাজানোর অধিকার কাহারো ছিলনা। ইহা 'শাহেরই নাই' হইতে সানাই নামের উৎপত্তি হইয়াছে। ইহা একপ্রকার বংশী বিশেষ এবং আকার অনেকটা ধুত্‌রা ফুলের মত। দৈর্ঘ্যে একহাত। সাধারণতঃ কাঠের তৈরী এবং নীচের দিক পিতল নির্ম্মিত থাকে। মুখ-রন্ধ্র উপরে। সেখানে দুইটী শর বা নলের পাত থাকে। প্রাচীন নাম কেহ কেহ "সুনাদি" বলিয়া থাকেন। বিবাহাদি মাঙ্গলিক উৎসবে বাজানো হইয়া থাকে।

১৮। **বাঁশী** :—বাঁশী বা বংশী বাঁশের তৈরী। ইহা বহু প্রাচীন ফুৎকার বাদ্য যন্ত্র। বংশী বা বাঁশী শব্দটি শুনিবামাত্র দ্বাপর যুগের বৃন্দাবনলীলার বংশীবাদনরত শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার লীলাসহচরী শ্রীরাধার কথা সর্ব্বাগ্রে মনে

পড়ে। প্রকৃত প্রস্তাবে শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক বাদিত বাঁশীর পূর্ব্বে বাঁশীর উল্লেখ কোথাও আছে কিনা তাহা জানা নাই। যে বেণু বাজাইয়া কৃষ্ণ গোষ্ঠে ধেনু চরাইতেন, যে বাঁশীর সুরে যমুনা উজান বইত ইদানীং কালের বাঁশী যে সেই বংশীরই বংশধর সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। যাহা হউক বাঁশীতে ছয়টি অথবা সাতটি ছিদ্র থাকে। একহাত পরিমিত সুগোল সরু বিশেষ এক জাতীয় বাঁশে বাঁশী প্রস্তুত হয়। বাঁশীর মুখরন্ধ্রের কিঞ্চিৎ নিম্নভাগে পর পর ছয়টি ছিদ্র থাকে এবং বিপরীত দিকে একটি ছিদ্র থাকে। যে বাঁশীর শীর্ষের গিট বন্ধ থাকে এবং গায়ে মুখরন্ধ্র ও যাহা আড়ভাবে ধরিয়া ঠোঁট কিঞ্চিৎ বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে হয় তাহার নামই আড় বাঁশী বা মূরলী। এতদ্ভিন্ন যে বাঁশীর শীর্ষভাগ বন্ধ নহে তাহাকে সরল বাঁশী বলা হয়।

বর্ত্তমান কালে আড় বাঁশী এবং টিপারা ফ্লুট (স্বাধীন ত্রিপুরায় তৈরী যে বাঁশীর খোলামুখে ঠোঁট কিঞ্চিত বাঁকাইয়া ফু দিয়া বাজাইতে হয়) এই দুই প্রকারের বাঁশীই প্রচলিত।

১৯। **বেণু** ঃ—সাধারণতঃ প্রচলিত বাঁশী অপেক্ষা দৈর্ঘ্যে এবং আয়তনে বড় বাঁশীকেই বেণু বলা হয়। বাঁশের প্রকার ও পরিমাপ ভেদে বাঁশীতে খাদের বা চড়ার সুর হইয়া থাকে এবং আট আঙ্গুল হইতে একহাত সাধারণ বাঁশীর মাপ। আড় বাঁশী বা বেণু সাধারণ বাঁশী হইতে আকারে বড়। বামহাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ ও দুই হাতের ছয়টি অঙ্গুলি দ্বারা বেণু ও বাঁশী বাজাইতে হয়।

নিপুন বেণুবাদক বেণু বা বাঁশীর সাতটি ছিদ্রে যাবতীয় রাগ রাগিনী বাজাইয়া থাকেন—যদিও তাঁহাদের সংখ্যা খুব বেশী নয়।

২০। **একতারা** ঃ—একটিমাত্র তারযুক্ত অতি প্রাচীন তার-যন্ত্র। লাউ বা কাঠের খোলের উপরিভাগ চর্ম্মাবৃত, খোলের উপরাংশের দুইদিকে দুইটি ছিদ্র—সেই ছিদ্র পথে ৩।৪ ফুট দীর্ঘ একটি সুগোল সরু আস্তবাঁশের দণ্ড আটকানো থাকে। বংশদণ্ডের মাথার দিকে একটি কান। চামড়ার ছাউনির উপরে একটি সওয়ারী বসানো—দণ্ডের গোড়ায় নিবদ্ধ তার

সওয়ারীর উপর দিয়া কানে জড়ানো থাকে। একটি অঙ্গুলি দ্বারাই যন্ত্রটি বাজাইতে হয় এবং তাহাতে একটি সুরই বাজে। এ যন্ত্র উত্তর ভারতে বহু প্রচলিত।

২১। **দোতারা** ঃ—এক সময়ে দোতারা দুইটি তারের যন্ত্রই ছিল কিন্তু পরবর্ত্তীকালে ইহার রূপ অনেকখানি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। বর্ত্তমানে ইহার আকৃতি একটি ক্ষুদ্রায়তন সরোদের ন্যায়। তাহাতে চারটি কান ও চারটি তার থাকে—তারের পরিবর্ত্তে কেহ কেহ তাঁত ও ব্যবহার করিয়া থাকেন। তাঁতের সুর বরঞ্চ অধিকতর মিষ্ট হয়। নিম, সেগুন বা তুঁতকাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রদণ্ড তৈরী করা হয়—যন্ত্রের নিম্নের কিয়দংশ চামড়ায় আবৃত ও উপরাংশের কাষ্ঠপাতের ঢাকনা যাহাকে পটরী বলা হয় তাহা ধাতুর পাতে মোড়ানো থাকে। চামড়ার ছাউনির উপর সওয়ারী থাকে তাহার উপর দিয়া তারগুলি কান পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। গানের সুরের প্রকৃতি অনুসারে তারে সুর বাঁধা হয় এবং কটি দ্বারা তারে আঘাত করিয়া যন্ত্রটি বাজাইতে হয়। পল্লীগীতে দোতারা একটি বহু প্রচলিত যন্ত্র।

২২। **সারিন্দা** ঃ—একখণ্ড কাঠ কুঁদিয়া যন্ত্রটী তৈরী হয়। তব্‌লীর চেহারা অনেকটা "৫" এর মত। দণ্ডটী দৈর্ঘ্যে ১ হইতে সওয়া হাতের মধ্যে—তব্‌লী ও তুম্বায় মিলিয়া ইহার ধ্বনিকোষ। এই ধ্বনিকোষের খানিকটা অংশ খোলা বাকীটা চামড়ায় ঢাকা। ৩টী কান ও ৩টী তাঁতের তার থাকে। তার গুলি সা প সা সুরে বাঁধিতে হয় এবং অশ্বপুচ্ছের ধনুদ্বারা বাজাইতে হয়। ইহাতে সারেঙ্গীর ন্যায় কোন বাঁধা পর্দ্দা নাই। ডান হাতে ধনু ধরিয়া ও বামহাতের অঙ্গুলি তারের উপর রাখিয়া বাজাইতে হয়। এই যন্ত্রটী বিশেষ করিয়া পূর্ব্ববঙ্গে পল্লী সঙ্গীতের সহিত বাজানো হইয়া থাকে।

২৩। **আনন্দলহরী** ঃ—ইহাকে গাবগুবাগুব ও বলা হইয়া থাকে। ইহার অল্পপরিসর কাষ্ঠনির্ম্মিত খোলটি দৈর্ঘ্যে আধহাত—দেখিতে ঢোলকের খোলের একটি ক্ষুদ্র সংস্করণের ন্যায়। ঐ খোলের তলার দিক্ চর্ম্মাবৃত, মুখটি খোলা। চর্ম্মের কেন্দ্রস্থল হইতে একটি গো-তন্তু বা অপর কোনও

তন্ত্রী উপরের দিকে উঠিয়া আসে ও একটি ক্ষুদ্র মেটে বা কাষ্ঠনির্ম্মিত ভাঁড়ের সহিত টানা দেওয়া থাকে। যন্ত্রটীকে বাম বগলে চাপিয়া রাখিয়া দক্ষিণ হস্তে কটি দ্বারা তন্ত্রীতে আঘাত করিলে সুশ্রাব্য টঙ্কার ধ্বনি-লহরী নির্গত হয়—এই কারণেই ইহার নাম আনন্দলহরী। বাউল বা অপরাপর গ্রাম্য গানের সহিত এ যন্ত্রটি বাজানো হইয়া থাকে। ইহার অপর নাম খমক্।

২৪। **পাখোয়াজ** ঃ—পাখোয়াজ প্রাচীন মৃদঙ্গের অনুকরণেই সৃষ্ট হইয়াছে। কেহ কেহ মনে করেন পাখোয়াজ শব্দটী ফার্সি শব্দ "পখ্" (পবিত্র)+আওয়াজ (ধ্বনি) হইতে আসিয়াছে। ইহা একটী মধুর গম্ভীর আওয়াজ বিশিষ্ট বাদ্য যন্ত্র। গাম্ভার, রক্তচন্দন, খদির বা নিম্ব কাষ্ঠদ্বারা ইহা প্রস্তুত হয়। ইহার দৈর্ঘ্য ১½ হাত হইতে ১¾ হাত। ইহার মধ্যভাগের পরিধি দুই মুখের পরিধি হইতে কিঞ্চিদধিক। বামদিকের মুখের ব্যাস ১২ হইতে ১৪ আঙ্গুল এবং ডানদিকের মুখের ব্যাস ৯ হইতে ১০ আঙ্গুল। দুই মুখে চামড়ার ছাউনি এবং দক্ষিণ মুখের মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়া থাকে। ইহার গায়ে চামড়ার ছোট্ (ফিতা) দিয়া আটকানো ৮টী গুলি থাকে, ইহারা সুর বাঁধায় সাহায্য করে। যন্ত্রের দুই মুখের বিনুনীকে ঐ ফিতাগুলি টানিয়া রাখে। বাজাইবার সময় বাম মুখে আটার প্রলেপ লাগাইবার রীতি আছে। বীণা, রবাব, সুরবাহার এবং ধ্রুপদ ও ধমারের সহিত এই যন্ত্রটী বিশেষভাবে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

২৫। **তবলা ও বাঁয়া** ঃ—আম, কাঁঠাল, খদির, নিম প্রভৃতি একখণ্ড কাঠের ভিতর দিক কুঁদিয়া তবলার খোল তৈরী হয়। গোড়ার দিক মোটা থাকে, মুখের দিক ক্রমে সরু হইয়া আসে। মুখে চামড়ার ছাউনি, মধ্যভাগে বৃত্তাকারে খিরন দেওয়া। মুখ ঘিরিয়া বৃত্তাকারে চামড়ার পাকানো বিনুনী আঁটা ও বিনুনীকে দোয়ালী বা ছোট্ দ্বারা তবলার তলার দিকের বৃত্তাকার ছোটের সহিত টানিয়া রাখা হয়। ইহার গায়ে ছোট্ দিয়া আটকানো ৮টী কাঠের গুলি থাকে, ইহারা সুর বাঁধায় সাহায্য করে।

বাঁয়া মাটির বা তামার খোলে প্রস্তুত হয়। মুখে চামড়ার ছাউনি এবং প্রায় মধ্যভাগে খিরন্ অথবা গাব দেওয়া। মুখের বেষ্টনী চাক, দড়ি অথবা ছোট্ দ্বারা তলার দিকে টানিয়া দেওয়া হয়। দড়ি ব্যবহার করিলে পিতলের কড়া থাকে। তবলা ও বাঁয়া খাড়া ভাবে বসাইয়া দুইটি যন্ত্র পাশাপাশি রাখিয়া সাধারণতঃ তবলা দক্ষিণ হস্তে এবং বাঁয়াটি বাম হস্তে বাজানো হয়।

২৬। **ঢাক** ঃ—ঢোল অপেক্ষাও বড়। ইহা কাঠের খোলের তৈরী। দুই দিকে দুইটি মুখ থাকে। এক একটি মুখের ব্যাস ১½ হাত পরিমাণ। বাম মুখটি পুরু চামড়ায় এবং অপরটি অপেক্ষাকৃত পাতলা চামড়ায় ছাওয়া। পুরু চামড়ায় ছাওয়া দিকটি অব্যবহৃতই থাকে। পাতলা চামড়ায় ছাওয়া মুখটি হালকা বাঁশের দুইটি চটী বা কাঠি দ্বারা দুই হাতে বাজানো হয়। দুর্গোৎসবে, চড়কে, কালীপূজায় ও বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠানে ঢাক-বাদ্য বহুল প্রচলিত।

২৭। **ঢোল** ঃ—ঢোলক অপেক্ষা আকারে বড়। খোলটী কাঠের তৈরী এবং ইহার দুইদিকে দুইটী মুখ, বামমুখে পুরু কড়া চামড়ার ছাউনি এবং ডান মুখে অপেক্ষাকৃত হাল্কা ও নরম চামড়ার ছাউনি থাকে। বামদিক বামহাতে এবং ডানদিক ডানহাতে সাপের ফনার মত ছোট ও মোটা একটী কাঠির দ্বারা বাজানো হয়। খোলের পৃষ্ঠদেশে দড়ির টানা দেওয়া থাকে এবং সুর বাঁধিবার সুবিধার জন্য দড়ির সঙ্গে পিতলের কড়া লাগানো থাকে। নানাবিধ পূজা-পার্ব্বণ ও পল্লীবাসীদিগের গার্হস্থ্য জীবনে বিবাহাদি নানা উৎসবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত বাদ্যযন্ত্র।

২৮। **ঢোলক** ঃ—ঢোলকের খোল কাষ্ঠ নির্ম্মিত, সেই খোলের উভয় মুখ পাতলা চামড়ায় আচ্ছাদিত থাকে। যন্ত্রের দু'মুখই প্রায় সমান ব্যাস বিশিষ্ট, মধ্যভাগ অপেক্ষাকৃত স্থূল। খোলের দুই মুখের চাক্ দড়িতে টানা দেওয়া থাকে এবং সুর বাঁধিবার সুবিধার জন্য দড়িতে পিতলের কড়া লাগানো থাকে। বাংলাদেশে যাত্রা-পাঁচালীতে এবং উত্তর ভারতে

বিভিন্ন উৎসবে ব্যবহৃত হয়। মহারাষ্ট্রীয় ঢোলক অপেক্ষাকৃত লম্বা ও সরু ধরণের হয়।

২৯। **মৃদঙ্গ বা শ্রীখোল** :—পৌণে দু হাত দীর্ঘ মাটির খোল—বামদিক আয়তনে ডানদিন অপেক্ষা দ্বিগুণের অধিক বড়। মধ্যস্থান মোটা। দুই মুখে চামড়ার ছাউনি ও মধ্যস্থলে খিরণ দেওয়া এবং দুই মুখের চামড়ার চাক বা বিণুনী চামড়ার দোয়ালী দ্বারা টানা দেওয়া। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাল হইতে বিশেষ করিয়া কীর্ত্তন গানের প্রধান আনুসঙ্গিক যন্ত্র।

৩০। **করতাল** :—শ্রীখোলের সহিত করতালের অন্তরঙ্গ সম্বন্ধ। কাঁসার দুইটি পাতের কেন্দ্রস্থলের ছিদ্রে দুইটি দড়ি করতালপৃষ্ঠের দিকে নির্গত করাইয়া দড়ি সমেত দুই হাতে দুইটি ধরিয়া মুখোমুখি আঘাত করিয়া বাজাইতে হয়। কীর্ত্তন বা ভজন গানে বহুল ব্যবহৃত বাদ্য যন্ত্র।

৩১। **মন্দিরা** :—ঢোলক, মৃদঙ্গ, পাখোয়াজ ও তবলা বাঁয়ার সঙ্গে তাল দিবার ছোট ছোট বাটির আকারের কাংস্য নির্ম্মিত বাদ্য যন্ত্র বিশেষ।

৩২। **খঞ্জনী** :—কাষ্ঠনির্ম্মিত চক্রাকার ক্ষুদ্র পটহ বিশেষ। এক মুখে চামড়ার ছাউনি দেওয়া অপর দিক খোলা। তলার দিক চওড়া, মুখ অপেক্ষাকৃত ছোট। খঞ্জনী আর এক প্রকার দেখিতে পাওয়া যায়। সেই খঞ্জনীর ধারের চাক্‌তির মাঝে মাঝে পিতলাদি ধাতুর জোড়া জোড়া চাক্‌তি কিঞ্চিৎ আল্‌গাভাবে আটকানো থাকে—বাজাইবার সময় খঞ্জনীতে হাতের আঘাতের সঙ্গে সঙ্গে সেই চাক্‌তিগুলিও বাজিয়া উঠে।

—০—

ষষ্ঠ অধ্যায়

স্বরলিপি (Notation System)

স্বর সমূহের প্রতীক চিহ্নের সাহায্যে সঙ্গীতকে লিপিবদ্ধ করাকেই স্বরলিপি বলা হয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে মনে রাখিতে হইবে কণ্ঠ সঙ্গীতের স্থলে স্বর, কথা ও তাল চিহ্ন এবং যন্ত্র সঙ্গীতের স্থলে স্বর, বিভিন্ন যন্ত্রের বিশিষ্ট সাঙ্কেতিক শব্দ ও তাল চিহ্নের সাহায্যেই স্বরলিপি করা হইয়া থাকে।

প্রয়োজনীয়তা—সর্ব্বধ্বংসী কালের করাল কবল হইতে সঙ্গীতকে রক্ষা করিবার একমাত্র উপায় স্বরলিপি। স্বরলিপির সাহায্যে ব্যক্তি-বিশেষের সঙ্গীতকে সম্পূর্ণরূপে ধরিয়া রাখিতে না পারিলে ও বহুলাংশে উহাকে রক্ষা করা সম্ভব। সঙ্গীত গুরুমুখী বিদ্যা। গুরুর সাহায্য ব্যতীত কেবল মাত্র স্বরলিপির সাহায্যে উহা আয়ত্ব করা একেবারেই অসম্ভব। কিন্তু উপযুক্ত গুরুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা লাভ করা সত্ত্বেও নানা কারণে অনভ্যাসের দরুণ ভুলভ্রান্তি ঘটিলে স্বরলিপির সাহায্যে অনেকটা শুধরাইয়া লওয়া যায়। প্রত্যহ স্বগৃহে সঙ্গীত শিক্ষকের সাহায্য লাভ করা সকলের পক্ষে সম্ভব নয় এমতাবস্থায় শিক্ষকের নিকট তালিম পাওয়া গান বাজনার প্রাত্যহিক অভ্যাসে স্বরলিপি অনেকটা সাহায্য করে। স্বরলিপির এই প্রয়োজনীয়তা কেবল মাত্র নবীন সঙ্গীত সাধকদের জন্যই নয় প্রথিতযশা সঙ্গীতজ্ঞদের পক্ষেও উহা অপরিহার্য্য। স্মৃতিশক্তি যতই প্রখর হউক না কেন উহা যে কখন ও ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইবে না তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ঐরূপ স্থলে একমাত্র স্বরলিপিই আমাদিগকে সত্যের পথে স্থির রাখিতে পারে।

স্বরলিপির অভাব জনিত ক্ষতি—খৃষ্টজন্মের তিন হাজার বৎসর পূর্ব্বেকার প্রাচীন যুগের সিন্ধু সভ্যতার সময় হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বিভিন্ন যুগে সাহিত্য, শিল্প ও

স্থাপত্যের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্গীত কলাও যথেষ্ট উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে স্বরলিপির প্রবর্ত্তন না হওয়ার দরুণ আমরা সঙ্গীতের তৎকালীন অমূল্য রত্নরাজি হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইয়াছি। বৈদিক যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০০) সামবেদ কি ভাবে গাওয়া হইত, অমর গায়ক ও রাগশিল্পী তানসেন এবং তাঁহার পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী কালের সুবিখ্যাত গায়ক বাদকেরা কি স্বতন্ত্র প্রণালীতে গান বাজনা করিতেন এবং তানসেনের সমসাময়িক কালের বাঙ্গালাদেশের অমূল্য সম্পদ কীর্ত্তনের প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে আমাদের নিকট কোন ও প্রত্যক্ষ প্রমাণ নাই। স্বরলিপির অভাবে কেবলমাত্র গুরু পরম্পরার পথে আমাদের নিকট যে সঙ্গীত-ধারা আসিয়া পৌঁছিয়াছে উহা হয়ত পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের একটা অপভ্রংশ মাত্র। সঙ্গীতের পূর্ব্বাচার্য্যগণের প্রখর স্মৃতি শক্তি, সংযম, একাগ্রতা, নিষ্ঠা এবং কঠোর সাধনার সহিত উত্তর কালের চঞ্চলমতি, অসংযত এবং সাধনা-বিমুখ সঙ্গীতজ্ঞদের তুলনা করিলেই বোঝা যাইবে গুরুপরম্পরায় সঙ্গীত আজ কোন্ পথে।

স্বরলিপির ক্ষেত্রে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুর এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডের অমর অবদান :—বাঙ্গালাদেশ এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষে বহুল প্রচারিত স্বরলিপির মধ্যে যথাক্রমে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপি এবং পণ্ডিত ভাতখণ্ডে প্রবর্ত্তিত স্বরলিপি সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। যাবতীয় রবীন্দ্র সঙ্গীত আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতিতে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে জ্যোতিরিন্দ্র নাথ ঠাকুরের নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের জনক পণ্ডিত ভাতখণ্ডে তাঁহার অনন্য সাধারণ সৃজনী প্রতিভা উদ্ভুত স্বরলিপির সাহায্যে আমাদের তথাকথিত গুরুপরম্পরালব্ধ মার্গসঙ্গীতকে স্বরলিপিবদ্ধ না করিলে হয়ত কালক্রমে উহা শ্মশান কিংবা কবরে আশ্রয় লাভ করিত। সুদীর্ঘ চল্লিশ বৎসরকাল তিনি অভূতপূর্ব্ব অধ্যবসায় এবং শ্রমনিষ্ঠা সহকারে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জনপদ, নগরী ও দেশীয় রাজ্যে পরিভ্রমণ করিয়া বিভিন্ন ঘরানার হিন্দু ও

মুসলমান ওস্তাদদের অসংখ্য গান শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে পরিশুদ্ধান্তে স্বরলিপিবদ্ধ করিয়া ভারতীয় ধ্বংসোন্মুখ মার্গ সঙ্গীতকে অমরত্বদান করিয়া গিয়াছেন। ভারতীয় সঙ্গীত এবং কৃষ্টির ইতিহাসে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের নাম চিরকাল স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে।

স্বরলিপির ক্রমবিকাশ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা :—

মোহন-জো-দাড়োর (খৃঃ পূঃ ৩০০০) খনন (excavation) হইতে প্রাগ্‌বৈদিক যুগের সঙ্গীতের উৎকর্ষতা সম্বন্ধে কতকটা নিদর্শন পাওয়া গেলে ও তৎকালে কোনও সাংগীতিক সঙ্কেত প্রচলিত ছিল কিনা তাহার কোনও ঐতিহাসিক নজীর পাওয়া যায় না। বৈদিক তথা সাম গানের যুগে (খৃঃ পূঃ ২০০০) সঙ্গীতের বিকাশ বড় কম হয় নাই অথচ ব্রাহ্মণ, সংহিতা, শিক্ষা প্রভৃতিতে স্বরলিপির কোনও উল্লেখ নাই। নারদী শিক্ষায় রাগের নামোল্লেখ আছে। ভরতনাট্য শাস্ত্রে জাতিরাগের উল্লেখ সুস্পষ্ট এবং কি কি বৈশিষ্ট্য থাকিলে স্বর সমন্বয়কে রাগ বলা যাইতে পারে তাহারও নির্দ্দেশ পাওয়া যায় কিন্তু সেখানে স্বরলিপির কোনও উল্লেখ নাই। নারদের মকরন্দে ও স্বরলিপির সন্ধান পাওয়া যায় না। সুতরাং প্রাগবৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ১২শ শতাব্দী পর্য্যন্ত সুদীর্ঘকালকে ভারতীয় সঙ্গীতের সাংগীতিক সঙ্কেতের 'অন্ধকার যুগ' বলা যাইতে পারে। ১৩শ শতাব্দীতে শার্ঙ্গদেবের রত্নাকরে আমরা সর্ব্বপ্রথম সাংগীতিক সঙ্কেতের পরিচয় পাইয়া থাকি। শার্ঙ্গদেব (১২১০—১২৪৭ খৃঃ) তাঁহার রত্নাকরে রক্তগান্ধারী রাগের নিম্নলিখিত স্বর সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন যথা—

পা নী সা সা গা সা পা নী
তং ০ বা ০ ল র জ নি
মা প ধা পা মা পা ধপ মগ
ণ বি ভূ ০ ০ ০ ০০ ০০

সাঁ সাঁ পা পা মা মা গা গা
ক র তি ল ক ভূ ০ ষ
মা মা মা মা মা মা মা মা
তিং ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

ধা নী পা মপ ধা নী পা পা | মা পা মা মপ ধা নী পা পা

[vide poona ed. p. 118-119]

এখানে মন্দ্রসপ্তকের চিহ্ন (০),—নি ধা পা

তার „ „ (I),—সা রী গা

বিভিন্ন স্বর একক হইলে সা রী গা মা পা ধা নী এবং অন্য স্বরের সহিত যুক্ত ভাবে ব্যবহৃত হইলে স র গ ম প ধ নি এইরূপে প্রয়োগ করা হইত। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ইহাকে স্বরলিপি আখ্যা দেওয়া যায় না। কারণ ইহাতে কোমল এবং তীব্র স্বর, মীড়, তাল এবং স্বরলিপির অন্যান্য আনুষঙ্গিক চিহ্ন সূচিত হয় নাই। ১৫শ শতাব্দীতে বিকানীরের রাণা কুম্ভ প্রণীত 'সংগীত রাজ' গ্রন্থেও রত্নাকরেরই অনুকরণে লিখিত স্বরলিপি দেখা যায়। রাগ-বিবোধ (১৬০৯ খৃঃ) এবং সংগীত পারিজাতে (১৭০০ খৃঃ) ও স্বরলিপি সম্বন্ধে কিছু পাওয়া যায় না। কাজেই দেখা যাইতেছে ১৩শ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে ১৯শ শতাব্দীর মধ্যভাগ অর্থাৎ ৬০০ বৎসর স্বরলিপির কোনও অনুশীলন হয় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে স্বরলিপি লিখিবার প্রণালী এইরূপ ছিল—

স, রে, রে, গ, গ, ম, ম, প, ধ, ধ, নি, নি, স

কোমলের উপরে ⌐| = র লেখা হইত। কড়ি মধ্যম ম।

মন্দ্র স্বরের নীচে শূন্য = নি ধ এবং তার স্বরের উপরে শূন্য = স রে গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে স্বনামধন্য রাজা সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর প্রথমতঃ ইংরেজী টনিক সোল্‌ফা তৎপর ষ্টাফ নোটেশানের অনুকরণে এতদ্দেশীয় সঙ্গীতের সাংগীতিক সঙ্কেতের প্রচলন করেন। সৌরীন্দ্র-মোহনের অনুপ্রেরণায় কৃষ্ণধন বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সঙ্গীত শিষ্য আসাম গৌরীপুরের রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়াষ্টাফ্ নোটেশান প্রচার করেন

কিন্তু উহা গুণীসমাজে সমাদর লাভ করে নাই। তৎপর উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর আকার মাত্রিক স্বরলিপির প্রবর্ত্তন ও প্রচার করেন। এই পদ্ধতি বাঙ্গালাদেশের গুণীসমাজে পরম সমাদরে গৃহীত হয়।

বর্ত্তমান কালে উত্তর ভারতীয় সঙ্গীতের বহুল প্রচারিত স্বরলিপি পদ্ধতির মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডে এবং পণ্ডিত বিষ্ণুদিগম্বরের প্রবর্ত্তিত পদ্ধতির (উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধে প্রবর্ত্তিত) উল্লেখ করা যাইতে পারে। উপরোক্ত পদ্ধতি দুইটীর মধ্যে পণ্ডিত ভাতখণ্ডেজীর পদ্ধতিই অপেক্ষাকৃত সহজ, সরল এবং বিজ্ঞানানুমোদিত। নিম্নে পণ্ডিত ভাতখণ্ডের এবং আকার মাত্রিক স্বরলিপির সাংগীতিক সঙ্কেত প্রদত্ত হইল।

(১) **ভাতখণ্ডেজীর স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেতঃ—**

(ক) সাতটী শুদ্ধ স্বর— সা রে গ ম প ধ নি।

(খ) পাঁচটী বিকৃত স্বর—রে গ মঁ ধ নি।

(গ) মন্দ্র স্বর—নি ধ প।

(ঘ) তার স্বর—সা রে গ।

(ঙ) একমাত্রার অন্তর্গত হইলে '◡' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা যুক্ত হয়।

(চ) মীড়-চিহ্ন— ⌒

(ছ) স্বরের পংক্তিতে স্বরের পুনরুক্তি '—' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা বোঝান হয়।

(জ) 'S' এইরূপ চিহ্নকে অবগ্রহ বলা হয়। উহা শব্দের পংক্তিতে থাকিয়া শব্দান্তের স্বরবর্ণ ধ্বনির সাহায্যে মাত্রা সূচিত করে। একই মাত্রায় দুইটি অবগ্রহ থাকিলে প্রত্যেকটি অর্দ্ধ, তিনটী থাকিলে এক তৃতীয়াংশ এবং চারিটী থাকিলে এক চতুর্থাংশ মাত্রা বুঝিতে হইবে।

(ঝ) কোনও স্বর '( )' এইরূপ যুক্ত বন্ধনী দ্বারা আবদ্ধ হইলে মূল স্বরটিকে যথাক্রমে একটি উপরের স্বর এবং একটি নীচের স্বরের সহিত যুক্ত করিতে হইবে যথা— (র্সা) = রে সা ন়ি সা,

(ম)=প ম গ ম, (প) = ধ প ম প।

(ঞ) কোনও স্বরকে ঈষৎ স্পর্শ করিয়া মূল স্বর গাওয়া হইলে উক্ত ঈষৎস্পৃষ্ট স্বরকে Grace-note, কণ, ভূষিকা বা স্পর্শ স্বর বলে। ঐ স্বরটিকে অপেক্ষাকৃত ছোট অক্ষরে মূল স্বরের বাম পার্শ্বে শীর্ষভাগে লিখিতে হয় যথা— ^ধ^প, ^গ^ম ইত্যাদি।

(ট) '|' এইরূপ চিহ্নের সাহায্যে তাল-বিভাগ বোঝান হইয়া থাকে যথা— দাদরা তাল— ১ ২ ৩ | ৪ ৫ ৬
× | ০

(ঠ) '×' এই চিহ্ন দ্বারা সম অথবা প্রথম তালি এবং ২, ৩, ৪ প্রভৃতির সাহায্যে যথাক্রমে ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ তালি সূচিত হয়। 'o' এইরূপ চিহ্ন দ্বারা ফাঁক অথবা খালি বোঝায়।

(২) **জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরের আকার মাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত :—**

(ক) স র গ ম প ধ ন=সপ্তক। খাদ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের নীচে হসন্ত, এবং উচ্চ সপ্তকের চিহ্ন, স্বরের মাথায় রেফ্ যথা— র্স, র্র।

(খ) কোমল র=ঋ; কোমল গ=জ্ঞ, কড়ি ম=হ্ম, কোমল ধ= দ এবং কোমল ন=ণ।

(গ) তাল-বিভাগের চিহ্ন, পার্শ্বে এক একটি দাঁড়ি।

(ঘ) তালের একফেরা হইয়া গেলে দাঁড়ির স্থলে "I" এরূপ একটি দণ্ড-চিহ্ন বসে। প্রায় প্রত্যেক কলির আরম্ভে দুইটি দণ্ড বসে ও যেখানে গান একেবারে শেষ হয় সেখানে চারিটি দণ্ড বসে।

(ঙ) পুনরাবৃত্তি অর্থাৎ অস্থায়ীতে প্রত্যাবর্ত্তনের চিহ্নস্বরূপ দুইটি করিয়া "দণ্ড" বসে। কোনো কলির শেষে II এই যুগল দণ্ড এবং সব শেষে দুই জোড়া দণ্ড দেখিলেই অস্থায়ীর প্রথমে যেখানে যুগল দণ্ড আছে সেইখান হইতে আবার আরম্ভ করিবে।

(চ) অস্থায়ীর আরম্ভে, II এই যুগল দণ্ডের বাইরে গানের অংশ গান ধরিবার সময় একবার মাত্র গাহিবে ; কারণ প্রত্যেক কলির শেষে এই অংশটুকু " " এইরূপ উদ্‌ধৃতি চিহ্নের মধ্যে পুনঃ পুনঃ লিখিত হইয়া থাকে।

(ছ) তাল সমূহ ভিন্ন ভিন্ন ভাগে বিভক্ত হইয়া ১, ২, ৩, ৪, ০ ইত্যাদি সংখ্যা দ্বারা চিহ্নিত হইয়া থাকে। "০" শূন্য চিহ্ন থাকিলে ফাঁক এবং যে সংখ্যার শিরোদেশে রেফ-চিহ্ন থাকে তাহাই সম্।

(জ) একমাত্রা=া। অর্দ্ধমাত্রা=ঃ। দুইটি অর্দ্ধমাত্রা, যথা 'সরা'। চারিটি সিকিমাত্রা, যথা 'স র গ মা'। দুইটি সিকিমাত্রা যথা সরঃ। একটি অর্দ্ধমাত্রা ও দুইটি সিকিমাত্রা মিলিয়া একমাত্রা যথা সঃ গরঃ। একটি দেড়মাত্রা ও একটি অর্দ্ধমাত্রা মিলিয়া দুইমাত্রা যথা রাঃ গঃ।

(ঝ) কোনো আসল স্বরের পূর্ব্বে যদি কোনো নিমেষকালস্থায়ী আনুষঙ্গিক স্বর একটু ছুঁইয়া যায় মাত্র. তাহা হইলে সেই স্বরটি ক্ষুদ্র

স গ

অক্ষরে আসল স্বরের বাম পার্শ্বে লিখিত হয়, যথা রা—রা। আসল স্বরের পরে কখনো কখনো অন্য স্বরের ঈষৎ রেশ লাগে ; তখন ঐ স্বর ক্ষুদ্র অক্ষরে দক্ষিণ পার্শ্বে লিখিত হয় ; যথা রাস।

(ট) বিরামের চিহ্ন ও মাত্রা সমূহের চিহ্ন একই ; হাইফেন - বর্জ্জিত হইলে এবং স্বরাক্ষরের গায়ে সংলগ্ন না থাকিলেই সেই মাত্রা বিরামের মাত্রা বলিয়া জানিবে। সুরের ক্ষণিক স্তব্ধতাকে বিরাম বলে।

(ঠ) অবসানের চিহ্ন, শিরোদেশে যুগল দাঁড়ি, হয় যথা—সা॥। এইখানে একেবারে থামিবে ; নতুবা এইখানে থামিয়া গানের অন্য কলি ধরিবে।

(ড) পুনরাবৃত্তির চিহ্ন এই { } গুম্ফ বন্ধনী ; এবং পুনরাবৃত্তিকালে কতকগুলি স্বর বাদ দিয়া যাইবার চিহ্ন এই ( ) বক্র বন্ধনী, যথা—{ সা রা গা (মা পা) ধা না }।

(ঢ) পুনরাবৃত্তিকালে কোনো স্বরের পরিবর্ত্তন হইলে, শিরোদেশে এই [ ] ব্রাকেট চিহ্নের মধ্যে পরিবর্ত্তিত স্বরগুলি স্থাপিত
[রা গা মা]
হয় ; যথা,—{ সা রা গা } এবং কলির শেষে যুগল দণ্ডের এর মধ্যে ও সব শেষে দুই জোড়া যুগল দণ্ডের এর মধ্যে এই [ ] ব্রাকেট চিহ্ন বসে ; যথা—I [ ] I, II [ ] II।

(ণ) কোনো এক স্বর যখন আর এক স্বরে বিশেষরূপে গড়াইয়া যায়, তখন স্বরের নিচে এইরূপ ‿ চিহ্ন থাকে যথা—ণা পা।

(ত) যখন স্বরের নিচে গানের অক্ষর না থাকে, তখন স্বরগুলির মধ্যে হাইফেন (-) চিহ্ন বসে এবং গানের পংক্তিতে শূণ্য (o) চিহ্ন দেওয়া হয় ; যথা—সা -া -া -া। অথবা সা -রা -গা -মা ইত্যাদি।
তু ০ ০ ০ তু ০ ০ ০

দণ্ডমাত্রিক স্বরলিপি পদ্ধতির সঙ্কেত ঃ—

সপ্তস্বর যথা ঃ—স ঋ গ ম প ধ নি

'△' 'ত্রিকোণ' এই চিহ্নটি কোমল স্বরের মাথায় বসে।

যথা ঃ—ঋ̂, গ̂, ধ̂, নি̂।

"⩘ 'পতাকা' চিহ্নটি কড়ি মধ্যমের মাথায় বসে।

যথা ঃ—ম̂̂।

। এই দণ্ড চিহ্নটি ১ মাত্রা নির্দেশক ও স্বরের উপরিভাগে দণ্ডের আকারে ব্যবহার হয় ও দণ্ডের সংখ্যানুপাতে মাত্রা সংখ্যাও বর্দ্ধিত হয়।

যথা ঃ স (একমাত্রা) স (দুইমাত্রা) স (তিনমাত্রা) স (চারমাত্রা)

'৺' (অর্দ্ধচন্দ্র) অর্দ্ধচন্দ্র এই চিহ্নটি "অর্দ্ধমাত্রা" নির্দেশ করে

যথা ঃ—সঁ।

'×' (ডমরু) ডমরু এই চিহ্নটি "সিকিমাত্রা" নির্দেশ করে

যথা ঃ—স।

৺× এই চিহ্নটি 'বার আনা" মাত্রা নির্দেশ করে

যথা ঃ— সঁ×।

এক মাত্রায় একাধিক স্বর উচ্চারিত হইলে সেই স্বরগুলি একসঙ্গে লিখিত হইয়া তাদের উপরে একটি দণ্ড চিহ্ন বসিবে

যথা—স স, স স স, স স স স

'·' এই বিন্দু চিহ্ন 'তারসপ্তকের" স্বরের উপরিভাগে এবং "উদারা সপ্তকের" স্বরের নিম্নভাগে ব্যবহৃত হয়

যথা ঃ—স এবং ; নি।

মধ্যসপ্তকের স্বরে কোন চিহ্ন ব্যবহার করা হয় না

যথা—স, ঋ, গ, ম ইত্যাদি।

'—' এই সরল রেখা "আশা" নির্দেশক ও স্বরের নীচে বসে

যথা ঃ—সঋগম

'=' দুইটি সরলরেখা "মীড়" নির্দেশক যথা ঃ—মগঋ

'⌒⌒' "গজকুম্ভাকৃতি" এই চিহ্নটি কম্পন নির্দ্দেশ করে ও স্বরের উপরে বসে। যথা ঃ—স =(সস)

ঋ গ
"স্পর্শ স্বর" বা "স্ব" এইভাবে লেখা হয় যথা ঃ—স, ঋ।

"{ }" দ্বিতীয় বন্ধনী এর মধ্যস্থিত স্বর ২ বার গাহিতে হয়
যথা ঃ—{ সঋগম }

{ ( ) } দ্বিতীয় বন্ধনীর মধ্যে প্রথম বন্ধনী। পুনরাবৃত্তি কালে প্রথম বন্ধনীর "অংশ" ত্যজ্য। যথা ঃ—{ সঋ(গম) পধ } অর্থাৎ দ্বিতীয়বার গাওয়ার কালে (গম) এই অংশটুকু গাহিতে হইবে না।

"S" মতি বা বিরাম চিহ্ন। এই চিহ্ন স্বরের উপরে বসে। ঐ চিহ্নিত স্থানে বিরাম নিয়া পরবর্ত্তী অংশ ধরিতে হয়।

১,২,৩,৪,০,+, এই চিহ্নগুলি তাল নির্দেশক ও স্বরপংক্তির উপরে থাকে।

১=১ম তাল, ২=২য় তাল, ৩=৩য় তাল, ৪=৪র্থ তাল, ০=ফাঁক, + =সম্-নির্দ্দেশ করে।

ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের বিভিন্ন রূপ

উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত বলিলে সাধারণতঃ ধ্রুবপদ, ধমার এবং খ্যালকেই বুঝায় কিন্তু ব্যাপক অর্থে ঠুংরী, টপ্পা, গজল, তরানা, চতুরংগ, সরগম এবং লক্ষ্মণ-গীতকে ও উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া ধরা হয়।

নিম্নে উহাদের প্রত্যেকটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদত্ত হইল।

ধ্রুবপদ—ধ্রুবপদ ভারতবর্ষের প্রাচীনতম উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত। ধ্রুব অর্থে স্থির এবং পদ অর্থে এখানে শব্দ বুঝায় কাজেই ধ্রুবপদ গান অর্থাৎ যে গানে শব্দ সমূহ পুনরুক্তি কালে ও মূল স্বর এবং তাল স্থান হইতে ভ্রষ্ট হয় না তাহাকে ধ্রুবপদ গান বলে। উহাকে সংক্ষেপে ধ্রুপদ বলা হয়।

পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সংস্কৃত ধ্রুপদ প্রচলিত ছিল কিন্তু আজকাল উহা সম্পূর্ণ অপ্রচলিত। ঐতিহাসিক আধারের সাহায্যে বলা যায় যে ধ্রুপদ গান ৫০০ বৎসর পূর্ব্ব হইতে প্রচলিত হইয়াছে। আকবর

বাদশাহের সভার যাবতীয় সুপ্রসিদ্ধ গায়কই ধ্রুপদ গায়ক ছিলেন। উহাদের মধ্যে অমর সুরশিল্পী তানসেনের নাম সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য। তানসেন বৃন্দাবনের হরিদাস স্বামীর শিষ্য ছিলেন। হরিদাস স্বামী, মিয়াঁ তানসেন, নায়ক গোপাল, নায়ক বৈজু, চিন্তামণি মিশ্র প্রভৃতি সুবিখ্যাত ধ্রুপদীয়ার রচিত গান আজ ও আমরা শুনিতে পাই। মিঁয়া-তানসেনের বংশধর উজীর খাঁ এবং মহম্মদ অলী খাঁ রামপুর ষ্টেটের সভা গায়ক ছিলেন। তৎকালে ধ্রুপদ গান হিন্দি, উর্দ্দূ কিংবা ব্রজভাষায় রচিত হইত। ধ্রুপদ খেয়ালের অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত। ইহাতে সাধারণতঃ স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী এবং আভোগ এই চারটি তুক (ধ্রুপদের অংশ) থাকে। কোন কোন ধ্রুপদে কেবলমাত্র স্থায়ী ও অন্তরা ও দেখা যায়। প্রাচীনকালে প্রসিদ্ধ ধ্রুপদ মাত্রেরই ৪টি তুক থাকিত এবং প্রতি তুকে কমের পক্ষে তিন চারিটি চরণ থাকিত। হিন্দুস্থানে কেহ কেহ ধ্রুপদ গানকে জোরদার অথবা মর্দানা গান বলিত। ঐরূপ বলিবার কারণ ও ছিল। প্রকৃত পক্ষে, বলিষ্ঠ, সুসংযত এবং উত্তম সাধক না হইলে যথাযতভাবে ধ্রুপদ গান করা একেবারেই অসম্ভব। ধ্রুপদ গান প্রধানতঃ বীর, শৃঙ্গার এবং ভক্তিরস ব্যঞ্জক এবং উহার ভাষা গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। উহা বেশীর ভাগ চৌতাল, সুরফাঁক, ঝাঁপ, তীব্রা, ব্রহ্ম এবং রুদ্রতালে গাওয়া হইয়া থাকে। ধ্রুপদ গায়ককে 'কলাবন্ত' এই সংজ্ঞা দেওয়া হয়। কলাবন্ত-দিগকে তাঁহাদের বাণী অনুসারে খণ্ডার, নোহার, ডাগর এবং গোবরহার এই চার শ্রেণীভুক্ত করা হইয়াছে। উপরোক্ত বিভিন্ন শ্রেণীভুক্ত গায়কদের বাণীর বিষয়ে কোন নিশ্চিত মত দেওয়া যায় না তবে কোন কোন সঙ্গীতজ্ঞের মতে প্রাচীনকালে গীতি বা গানের শুদ্ধা, ভিন্না, বেসরা, গৌড়ী, সাধারনী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রচলিত রীতি হইতেই ঐ বাণীগুলির উৎপত্তি হইয়াছে। খ্যালের ন্যায় ধ্রুপদে তান ব্যবহার করা হয় না। ইহাতে মীড়, গমক ও বোলতান ব্যবহার করা হয় এবং মূল গানটিকে দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ প্রভৃতি বিভিন্ন ছন্দে গান করা হয়।

শুদ্ধা—বক্র এবং সুমিষ্ট স্বরের গীতি।

ভিন্না—সূক্ষ্ম, বক্র, মধুর এবং গমক বিশিষ্ট গীতি।

গৌড়ী—গম্ভীর, মন্দ্র-মধ্য—তার স্থানে গমক যুক্ত মধুর গীতি।

সাধারণী—মন্দ্র স্থানে কম্পিত এবং দ্রুততর স্বরবিন্যাসের সাহায্যে হ'কার ও উ'কার যোগে রচিত গীতি।

বেসরা—অত্যধিক বেগযুক্ত স্বর-সমষ্টি-রচিত সুমধুর গীতি।

উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্য্যন্ত ধ্রুপদ গান বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল। তৎপরবর্ত্তী কালে ক্রমশঃ খ্যাল গানই অধিকতর লোকপ্রিয় হইয়া উঠে। বর্ত্তমান কালে ধ্রুপদ গানের চর্চ্চা খুবই কম হইয়া থাকে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতকে পুনরুজ্জীবিত করিতে হইলে পুনরায় ধ্রুপদের চর্চ্চা ও বহুল প্রচার অপরিহার্য্য।

ধমার—ধমার আসলে একটি তালের নাম কিন্তু প্রচলিত কথায় হোরী নামক প্রবন্ধ ধমার তালে গাওয়া হইলে উহাকেই 'ধমার' (গান) বলা হইয়া থাকে। হোরী প্রবন্ধে প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের বসন্তকালীন লীলাবর্ণনা করা হইয়া থাকে। ধ্রুপদের ন্যায় ধমারে ও তান প্রয়োগ করা হয় না—ইহাতে বোলতান, মীড় ও গমকের ব্যবহার করা হয় এবং উহা দ্বিগুণ, তিনগুণ, চৌগুণ এবং অন্যান্য নানা প্রকার সুললিত ছন্দে গাওয়া হয়। সাধারণতঃ ধ্রুপদিয়ারাই ধমার গাহিয়া থাকেন কিন্তু কোন কোন খেয়াল গায়ককেও প্রারম্ভে ধমার গাইতে শুনা যায়।

খ্যাল—ধ্রুপদ গান হইতেই খ্যালের উৎপত্তি হইয়াছে। খ্যাল একটি ফার্সী শব্দ। এই শ্রেণীর গানে গায়কের ধ্রুপদের অপেক্ষা অনেকটা স্বাধীনতা কাছে। ইহাতে মূল গানের ভিন্ন ভিন্ন অংশকে রাগ বিশেষের স্বতন্ত্র নিয়মানুযায়ী বিভিন্ন স্বর সমন্বয়ে সুললিত ছন্দে বদ্ধ করিয়া খেয়াল অনুযায়ী গাওয়া যায়। ইহা তান, বোলতান, মীড়, গমক সহকারে নানাবিধ বিচিত্র ছন্দে গাওয়া হইয়া থাকে। জৌনপুরের সুলতান হুসেন শর্কি সর্ব্বপ্রথম এই ঢংয়ের গান প্রচলন করেন। মোগল বাদশাহ মহম্মদ শাহের (১৭১৯—১৭৪০) দরবারে সদারঙ্গ এবং অদারঙ্গ নামক দুইজন

সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন। তাঁহারা কয়েক সহস্র খ্যাল গান রচনা করেন। আজকাল সমগ্র হিন্দুস্থানে তাঁহাদের রচিত অনেক গান গাওয়া হইয়া থাকে। তাঁহারা তাঁহাদের শিষ্যদিগকে খ্যাল গান শিখাইয়াছিলেন কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই নিজেদের বংশের কাহাকেও খ্যাল শিখান নাই। আধুনিক কালে আমরা যে খ্যাল গান শুনিয়া থাকি উহা প্রধানতঃ সদারঙ্গ অদারঙ্গ এবং তাহাদের শিষ্য পরম্পরায় প্রচারিত। গোয়ালিয়র ষ্টেটের হোদ্দু খাঁ, হোস্সু খাঁ, নোথু খাঁ এবং তাহাদের পূর্ব্বপুরুষ নথন পীরবক্স সদারঙ্গ-অদারঙ্গের ঘরানার গায়ক বলিয়া পরিচিত।

হুসেন শর্কির প্রচারিত খ্যালে ৪টি তুক ছিল উহাদিগকে ওলার বলা হইত। আজকাল খ্যালে মাত্র স্থায়ী ও অন্তরা এই দুইটি তুক আছে। আজকাল সাধারণতঃ খ্যাল দুই প্রকার বলিয়া মানা হয়—বড় খ্যাল ও ছোট খ্যাল। যে সব খ্যাল তিলওয়াড়া, ঝুমরা, বিলম্বিত একতাল প্রভৃতি তালে গাওয়া হইয়া থাকে তাহাদিগকে বড় খ্যাল বলে। বড় খ্যালের গতি ধ্রুপদের মত এইজন্য উহা খুব বিলম্বিত লয়ে চলে এবং বিশেষ রূপে অলঙ্কৃত হইয়া থাকে। ইহার প্রকৃতি গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। ছোট খ্যাল ত্রিতাল, একতাল, দাদরা, ঝাঁপতাল প্রভৃতি মধ্য এবং দ্রুতলয়ের তালে গাওয়া হইয়া থাকে। ইহার প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত চঞ্চল।

সরগম, তেলানা, ত্রিবট, চতুরঙ্গ, রাগমালা, কওয়াল এবং কলওনা প্রভৃতি ও খ্যালের অন্তর্গত।

সরগম অথবা স্বরমালিকা—কোন ও রাগবিশেষে ব্যবহৃত স্বর সমূহে মনোরঞ্জক এবং তালবদ্ধ রচনাকে সরগম বলা হয়। বিদ্যার্থীদিগকে স্বরজ্ঞান ও রাগজ্ঞানে সুদক্ষ করিয়া তোলাই ইহার মুখ্য উদ্দেশ্য।

তরানা বা তেলেনা—না, না, তা, রে, দানি, ওদানি, তালুম, ইয়াললি, ইয়ালুম, তদারেদানি ইত্যাদি বোল কোনও রাগবিশেষে ব্যবহৃত স্বর সমূহের সাহায্যে বিভিন্ন দ্রুত তালে গাওয়া হইলে উহাকে তেলেনা বলে। তেলেনা গানের অংশবিশেষে তবলা বা পাখোয়াজের বোল এবং সরগম ও ব্যবহার করা হয়।

ত্রিবট—ইহা অনেকটা তেলেনার মত। ইহাতে তিনটি তুক বা অংশ থাকে। তিনটি তুকে যথাক্রমে আলাপের বোল, বাদ্যের বোল এবং স র গ ম তালবদ্ধ করিয়া গাওয়া হয়! তিনটি তুকের যেখানেই হোক 'ত্রিবট' শব্দটি ব্যবহার করা হইয়া থাকে।

চতুরঙ্গ—ইহার চারিটি অবয়ব আছে—খ্যাল, তরানা, সরগম এবং ত্রিবট। ১ম ভাগে গীতের শব্দ, ২য় ভাগে তরানার বাণী, ৩য় ভাগে সরগম এবং ৪র্থ ভাগে মৃদঙ্গ অথবা তবলার বাণী থাকে।

রাগমালা—কতকগুলি রাগ একত্র গ্রথিত করিয়া পর্য্যায়ক্রমে তান সহযোগে গাওয়াকে রাগমালা বলে। রাগমালার প্রত্যেক রাগের স্বতন্ত্র রূপ পরিস্ফুট করিতে হয় এবং মূল স্থায়ীর সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে হয়।

কওয়াল—কওয়াল বাণীর খ্যাল গায়কগণ নিজেদের আমীর ঘুসরুর ঘরানা বলিয়া পরিচয় দেন। দিল্লী, লক্ষ্ণৌ এবং লাহোরে এখনও এই ঘরানার গায়ক আছেন। হজরত মহম্মদের গুণকীর্ত্তনই উহাদের গানের বৈশিষ্ট্য। খ্যালে শৃঙ্গার রসাত্মক কথার প্রয়োগ অধিক হয়। ধ্রুপদের ন্যায় খ্যালে গাম্ভীর্য্য, শব্দ বৈচিত্র এবং শুদ্ধতা পরিলক্ষিত হয় না।

ঠুংরী—ঠুংরী একপ্রকার ক্ষুদ্রগীত। ইহার রচনা শৃঙ্গার রসাত্মক এবং সংক্ষিপ্ত। ইহা প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু বরওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে এবং পঞ্জাবী ত্রিতাল, যৎ, দাদরা ইত্যাদি তালে গাওয়া হইয়া থাকে। ঠুংরীতে রাগের শুদ্ধতার দিকে তত নজর দেওয়া হয় না। গায়ক জ্ঞাতসারে ভিন্ন ভিন্ন রাগের মিশ্রনে ঠুংরী গাহিয়া থাকেন। লক্ষ্ণৌ এবং বারাণসীর ঠুংরী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রুতিমধুর এবং লোকপ্রিয়।

টপ্পা—টপ্পা একটি হিন্দী শব্দ। ইহার রচনা অতি সুললিত। ইহা প্রধানতঃ আদিরসাত্মক। অতি প্রাচীনকালে পঞ্জাব দেশবাসী উষ্ট্র-পালকেরা অনেকটা এই প্রণালীর গান গাহিত কিন্তু তৎকালে উহার

ততটা মাধূর্য্য এবং বৈচিত্র ছিল না। পরবর্ত্তীকালে শৌরীমিয়া সর্ব্বপ্রথম সভ্যসমাজে এই ঢংয়ের গান প্রচলিত করেন। এই গানের রচনা বেশীর ভাগই পঞ্জাবী শব্দ বহুল। ইহার প্রকৃতি চঞ্চল। টপ্পার রূপ ধ্রুপদ ও খ্যাল হইতে সংক্ষিপ্ত অর্থাৎ ইহার রচনায় খুব কম শব্দ প্রয়োগ করা হয়। টপ্পার স্থায়ী এবং অন্তরা এই দুইটী ভাগ অথবা "তুক" আছে। খ্যালে যে সমস্ত তাল ব্যবহৃত হয় টপ্পাতে ও সেই সব তাল ব্যবহার করা হয়। টপ্পা প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু, বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ ইত্যাদি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে।

গজল—অধিকাংশ গজল গান উর্দ্দু এবং ফার্সী ভাষায় রচিত। ইহা বেশীর ভাগ পস্তু এবং দীপচন্দী তালে গাওয়া হইয়া থাকে। পস্তু তাল মাত্রা এবং তালির দিক হইতে রূপক তালের ন্যায়। গজলের রচনা প্রধানতঃ শৃঙ্গার রসাত্মক। কোন কোন গানের শব্দ রচনা গাম্ভীর্য্য এবং উচ্চভাব পূর্ণ হইয়া থাকে। ইহাতে অনেক গুলি চরণ (অংশ) থাকে। স্থায়ী ছাড়া অন্য সমস্ত গুলিকেই অন্তরা বলা হয়। সমস্ত অন্তরাই একসুরে গাওয়া হইয়া থাকে। গজল ভাল করিয়া গাহিতে হইলে উত্তম ভাষা-জ্ঞান থাকা দরকার। টপ্পা ও ঠুংরীর ন্যায় গজল ও প্রধানতঃ কাফী, ঝিঁঝোটি, পিলু,বারওয়া, মাঁড, ভৈরবী, খমাজ প্রভৃতি রাগে গাওয়া হইয়া থাকে।

লক্ষণ গীত—রাগের লক্ষণ-নির্ণয়কারী গীতকে লক্ষণ-গীত বলা হয়। ইহা কোন ও একটি নির্দ্দিষ্ট রাগে এবং নির্দ্দিষ্ট তালে গাওয়া হয়। লক্ষণ গীতে রাগ বিশেষের ঠাট, উহাতে কি কি স্বর লাগে, বাদী-সংবাদী কি এবং গাহিবার মোটামুটি সময় বর্ণিত থাকে।

সপ্তম অধ্যায়

কীর্ত্তন

আকবর বাদশাহের দরবারের শ্রেষ্ঠ গায়ক, বিশ্ব-বিশ্রুতকীর্ত্তি তানসেন যে সময়ে তাঁহার অভূতপূর্ব্ব সঙ্গীত-প্রতিভায় ভারতীয় সঙ্গীত জগতে নবযুগের সূচনা করিয়াছিলেন সেই সময়ে বৈষ্ণব সাধকগণ কীর্ত্তনের অমৃতধারায় সমগ্র বঙ্গদেশে এক অভূতপূর্ব্ব ভাব বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিলেন। কীর্ত্তনকে লোক সঙ্গীত, সেন্টিমেণ্টাল সঙ্গীত, নাট্যসঙ্গীত প্রভৃতি নানাবিধ আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়, কিন্তু উহার সত্যিকারের পরিচয় উহা নয়।

কৃ ধাতুর অর্থ প্রশংসা। শ্রীকৃষ্ণের রূপগুণ বর্ণনাত্মক প্রশংসা গীতি হইতেই 'কীর্ত্তন' শব্দটি উদ্ভূত। বৈষ্ণব শাস্ত্রে নববিধা ভক্তির প্রসঙ্গে কীর্ত্তনের উল্লেখ আছে—

শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং।
অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥

ভগবদ্‌বিষয়ক সঙ্গীত—বিশেষ করিয়া রাধাকৃষ্ণলীলা অবলম্বনে রচিত সঙ্গীতই কীর্ত্তন নামে অভিহিত। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে অদ্যাবধি একাদিক্রমে পাঁচশত বৎসরের অধিককাল যাবৎ জাহ্নবীর পূতধারার ন্যায় কীর্ত্তন-সঙ্গীতের পূতধারায় বাঙ্গালা দেশের কাব্য এবং ভাবধারা একান্তভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন কোন প্রদেশের লোক-সঙ্গীতে কীর্ত্তনের প্রভাব কতক পরিমাণে পরিলক্ষিত হইলেও প্রকৃতপক্ষে কীর্ত্তন বাঙ্গালীর এবং বাঙ্গালা দেশের বিশিষ্ট সঙ্গীত। মার্গ-সঙ্গীতের সহিত যথেষ্ঠ সাদৃশ্য বর্ত্তমান থাকায় কেহ কেহ কীর্ত্তনকে প্রাচীন বাঙ্গালার মার্গ-সঙ্গীত বলিয়া থাকেন। ভারতবর্ষের কোনও প্রদেশে কিংবা পৃথিবীর কোনও দেশের কণ্ঠ সঙ্গীতে কীর্ত্তনের ন্যায় সুর, কাব্য ও ধর্ম্মের এমন অপূর্ব্ব ত্রিবেণী-সঙ্গম পরিদৃষ্ট হয় না।

প্রাক্ চৈতন্য যুগেও অমর কবি জয়দেব, বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাসের স্বর্গীয় সুষমামণ্ডিত পদাবলী অবলম্বনে কীর্ত্তন গান করা হইত। কিন্তু মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু প্রেম-ধর্ম্ম প্রচার মানসে কীর্ত্তনের সাহচর্য্যে আমাপর সর্ব্বসাধারণকে নামামৃত দানে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ দান করেন, এই জন্য অনেকে তাঁহাদিগকেই কীর্ত্তনের প্রবর্ত্তক বলিয়া থাকেন।

কীর্ত্তন প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত—নাম সংকীর্ত্তন ও লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন।

নাম সংকীর্ত্তন—নাম সংকীর্ত্তনে 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে'

ভগবানের এই নাম অথবা উহার সহিত 'শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ, হরে কৃষ্ণ হরে রাম রাধে গোবিন্দ' জুড়িয়া দিয়া ভিন্ন ভিন্ন ছন্দে বা তালে এবং বিভিন্ন সময়োপযোগী রাগে সমবেত কণ্ঠে গীত হয়। ইউরোপের গীর্জ্জার-সঙ্গীত এবং জাতীয় সঙ্গীতের তুলনায় একমাত্র নাম সংকীর্ত্তনকেই ভারতবর্ষের Mass singing বা জনসঙ্গীত বলা যাইতে পারে।

চিত্তশুদ্ধি লাভেই নাম সংকীর্ত্তনের সার্থকতা। নামের মাহাত্ম্যে বিষয়-বিষ-জর্জরিত ও কামনা বাসনায় নিমগ্ন পঙ্কিল মন ধীরে ধীরে নিষ্কলুষ হইয়া ভগবৎ স্বরূপ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হয়।

লীলাকীর্ত্তন—রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বনে যে সকল গীত গাওয়া হয় তাহা লীলাকীর্ত্তন বা রসকীর্ত্তন নামে অভিহিত। লীলা তথা রসকীর্ত্তনের পাঁচ শাখা—গরেরহাটি, মনোহরসাহী, রাণিহাটি, মন্দারিণী ও ঝাড়খণ্ডি। গরেরহাটি ও রানিহাটি এই দুইটি ঘরোয়ানাকে কেহ কেহ "গরাণহাটি" ও "রেনিটি" বলিয়া অভিহিত করেন। যাহা হউক প্রথমোক্ত দুইটি ঘরোনা অপেক্ষাকৃত উদাত্ত ও গাম্ভীর্য্যপূর্ণ। পাঁচটি স্থানের নামানুসারে পাঁচটি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয় এবং তাঁহারাই কীর্ত্তন

প্রচার করেন। গায়কীর প্রভেদ থাকা সত্বেও সুর, তাল ও রস পর্য্যায় একই প্রকার ছিল। এখনও দুই শ্রেণীর গায়ক দেখা যায়। এক শ্রেণী সাধারণের গ্রহণ উপযোগী করিয়া পদবিন্যাস ও সুর তাল প্রয়োগ করিয়া থাকেন, আর এক শ্রেণী তাঁহাদের ভজন আনুকূল্যার্থে প্রাচীন পদ্ধতি অনুসারে কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

বৈষ্ণব শাস্ত্রকারগণ দশ প্রকার রসের বর্ণনা করিয়াছেন যথা—শৃঙ্গার, হাস্য, করুণ, রৌদ্র, বীর, ভয়ানক, বিভৎস, অদ্ভুত, শান্ত, বাৎসল্য। তন্মধ্যে গোস্বামীগণ শৃঙ্গার রসকে প্রধান্য দিয়াছেন। চতুঃষষ্ঠী রস ইহারই অন্তর্গত। শৃঙ্গার রস দুই ভাগে বিভক্ত। বিপ্রলম্ভ, (বিরহ) ও সম্ভোগ (মিলন)। বিপ্রলম্ভ চারি প্রকার—পূর্ব্বরাগ, মান, প্রেম-বৈচিত্ত্য ও প্রবাস। সম্ভোগ চারিপ্রকার—সংক্ষিপ্ত, সংকীর্ণ, সম্পন্ন ও সমৃদ্ধিমান।

পূর্ব্বরাগ

৮ প্রকার—সাক্ষাৎ দর্শন, চিত্রপট দর্শন, স্বপ্নে দর্শন, বন্দী ও ভাটমুখে শ্রবণ, দূতীমুখে শ্রবণ, সখীমুখেশ্রবণ, গুণীজনের গানে শ্রবণ ও বংশীধ্বনি শ্রবণ।

মান

৮ প্রকার—সখী মুখে শ্রবণ, শুক মুখে শ্রবণ, মূরলীধ্বনি শ্রবণ, বিপক্ষ-গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, প্রিয় গাত্রে ভোগ চিহ্ন দর্শন, গোত্রস্খলন, স্বপ্নে দর্শন ও অন্য নায়িকার সঙ্গদর্শন।

প্রেম বৈচিত্ত্য

৮ প্রকার—শ্রীকৃষ্ণের প্রতি আক্ষেপ, নিজের প্রতি আক্ষেপ, সখীর প্রতি আক্ষেপ, দূতীর প্রতি আক্ষেপ, মূরলীর প্রতি আক্ষেপ, বিধাতার প্রতি আক্ষেপ, কন্দর্পের প্রতি আক্ষেপ ও গুরুজনের প্রতি আক্ষেপ।

প্রবাস

৮ প্রকার—ভাবি (ভবিষ্যৎ), মথুরাগমন, দ্বারকাগমন, কালীয়দমন, গোচারণের জন্য বনে গমন, নন্দমোক্ষণ, কার্য্যানুরোধে স্থানান্তর গমন ও রাসে অন্তর্দ্ধান।

সন্তোগ ও সংক্ষিপ্ত

৮ প্রকার—বাল্যাবস্থায় মিলন, গোষ্ঠে গমনকালে মিলন, গোদোহন-কালে মিলন, অকস্মাৎ মিলন, হস্তাকর্ষণরূপ মিলন, বর্ত্মরোধ মিলন, রতিভোগরূপ মিলন, বস্ত্রাকর্ষণ মিলন।

সংকীর্ণ

৮ প্রকার—মহারাস, জলকেলি, কুঞ্জলীলা, দানলীলা, বংশীচৌর্য্য, নৌকাবিলাস, মধুপান, সূর্যপূজা।

সম্পন্ন

৮ প্রকার—সুদূরদর্শন, ঝুলনযাত্রা, হোলীলীলা, প্রহেলিকা, পাশক-ক্রীড়া, নর্ত্তক রাস, রসালস, কপটনিদ্রা।

সমৃদ্ধিমান

৮প্রকার—স্বপ্নেমিলন, কুরুক্ষেত্রেমিলন, ভাবোল্লাস, দ্বারকা হইতে ব্রজেগমন, বিপরীত সম্ভোগ, ভোজন কৌতুক, একত্র নিদ্রা ও স্বাধীন ভর্ত্তৃকা। রসকীর্ত্তন পর্য্যায়ের যাবতীয় পদ উল্লিখিত লীলার অন্তর্গত।

কীর্ত্তনের বাদ্যযন্ত্র—শ্রীমহাপ্রভু প্রবর্ত্তিত শ্রীখোল ও করতাল যন্ত্র কীর্ত্তনের সহিত সংগৎ হইয়া থাকে। "প্রভুর সম্পত্তি শ্রীখোল করতাল" (ভক্তি রত্নাকর)। ইহা ব্যতীত বহুপ্রকার যন্ত্রও ব্যবহার হইত যাহার উল্লেখ প্রাচীন গ্রন্থাদিতে পাওয়া যায়।

লীলা গানের অন্তর্নিহিত আধ্যাত্মিক ভাব সকলে সম্যক উপলব্ধি করিতে না পারিয়া উহার বিকৃত অর্থ করিয়া থাকেন। ঐরূপ অনধিকারীর পক্ষে নাম সংকীর্ত্তনই শ্রেয়ঃ।

প্রাচীন উক্তি

"বহিরঙ্গসনে নাম সংকীর্ত্তন, অন্তরঙ্গসনে রস আস্বাদন"

বৈষ্ণব মহাজন রচিত পদাবলী অবলম্বনে এই লীলাকীর্ত্তন গাওয়া হইয়া থাকে। বৈষ্ণব পদাবলী প্রথম যুগ—আনুমানিক দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হইতে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ। জয়দেবই সর্ব্বপ্রথম পদাবলী-রচয়িতা। "গীত গোবিন্দ" তাঁহার রচিত অমর গীতি কাব্য। পরবর্ত্তীকালে পদাবলীর প্রথম যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বিদ্যাপতি ও চণ্ডীদাস যথাক্রমে মৈথিলি ও বাঙ্গলা ভাষায় সর্ব্বপ্রথম পদাবলী রচনা করেন।

পরবর্ত্তীকালে বাঙ্গালী কবিরা বিদ্যাপতির অনুকরণে 'ব্রজবুলি' ভাষায় এবং চণ্ডীদাসের অনুকরণে বাঙ্গালা ভাষায় সহস্র সহস্র পদবলী রচনা করেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগ পর্য্যন্ত পদাবলীর মধ্যযুগের পদকর্ত্তাদের মধ্যে বাসু ঘোষ, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, বলরাম দাস, রায়শেখর, ঘনশ্যাম প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের মধ্যে গোবিন্দ দাস সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। বৈষ্ণব পদাবলীর তৃতীয় যুগ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ পর্য্যন্ত। পদকর্ত্তা কৃষ্ণকমল গোস্বামী এই যুগের শ্রেষ্ঠ কবি।

ভক্তি রত্নাকরে গৌরচন্দ্রিকা সম্বন্ধে দেখিতে পাই "রাধা ভাবে বিভাবিত নদীয়ার চান্দ। সেই ভাবময় গীতি রচনা সুছাঁদ"। গৌরচন্দ্রিকা বা গৌরচন্দ্র শব্দ ভক্তের উক্তি ও শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধার মিলিত বিগ্রহ। "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" (চৈতন্য চরিতামৃত)। কখনও রাধাভাবে কখনও বা শ্রীকৃষ্ণের ভাবে তিনি আবিষ্ট থাকিতেন। মহাপ্রভুর সেই ভাবাবিষ্ট অবস্থার বর্ণনাই গৌরচন্দ্রিকা। শ্রীগৌরাঙ্গ সম্বন্ধীয় রচনাকে কখনও কখনও গৌরচন্দ্রিকা বলিয়া অভিহিত করা যয়।

পদাবলীকে তিন দিক দিয়া বিচার করিতে পারা যায় (১) সাহিত্যের দিক দিয়া ইহা গীতি কবিতা (Lyrics) (২) সঙ্গীতের দিক দিয়া ইহা

কীর্ত্তন, (৩) আধ্যাত্মিক দিক দিয়া ইহা ভগবৎসাধনা। পদাবলীতে শান্ত, দাস্য, সখ্য বাৎসল্য ও মধুর এই পাঁচটি রসের প্রাধান্য দেখা যায়। এই সকল রস অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন পালা কীর্ত্তন গীত হইয়া থাকে।

কীর্ত্তনে যে সুরগুলি ব্যবহৃত হয় যথা—কামোদ, গৌরী, ভীমপলাশী, ধানশ্রী বা মায়ূর, তাহাদের প্রত্যেকটির একটি বিশিষ্ট রূপ আছে। কীর্ত্তনের বৈশিষ্ট্য, ইহার লালিত্য এবং বিশেষ করিয়া ইহার ভাবাবেদন সুররসিক মাত্রেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কীর্ত্তন গানের সুরস্রষ্টাগণ অদ্ভূত প্রতিভা বলে নানাবিধ কারুসমন্বিত সুর আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

ইহাতে কথা ও সুর সম-প্রাধান্য-প্রাপ্ত। কীর্ত্তনে উচ্চাঙ্গের সুরের ব্যঞ্জনার সহিত অত্যুৎকৃষ্ট কবিত্বের সমন্বয় দেখা যায়। কাব্য ও সঙ্গীতের ঐরূপ অঙ্গাঙ্গিভাব অন্য কোথায়ও দেখা যায় না।

পদাবলী প্রধানতঃ রাধাকৃষ্ণের লীলা অবলম্বন করিয়াই রচিত। কিন্তু প্রেমের অবতার শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যখন নদীয়ায় আবির্ভূত হইলেন তখন হইতে গৌরলীলা সম্বন্ধে পদাবলী রচিত হইতে লাগিল। শ্রীকৃষ্ণভজন পূর্ব্ব হইতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু শ্রীচৈতন্য তাঁর প্রেমধর্ম্মে এই কৃষ্ণলীলার স্থান দিলেন সর্ব্বোপরি, তাই প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ স্মরণে কীর্ত্তনে গৌরচন্দ্রিকা গান করিয়া তৎপর রাধাকৃষ্ণলীলা গান করিতে হয়। কৃষ্ণের অবতার বলিয়া গৌরচন্দ্রের প্রতি কৃষ্ণলীলার অনেকগুলি ভাবই সহজে আরোপিত হয়। তিনি যে ভাবে লীলা আস্বাদন করিতেন ভক্ত-বৈষ্ণবেরা সেইভাবে লীলা আস্বাদন করিতে চেষ্টা করেন।

কীর্ত্তনের তাল সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু নাম দেখা যায়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত তালগুলি অধিকতর পরিচিতঃ দাসপ্যারী, দশকুশী সমতাল, রূপক, বিষয়-পঞ্চম, তেওট, তেওরা, একতালি, ঝাঁপতাল, হুঠুকী, ব্রহ্মতাল, রুদ্রতাল, লোফা ইত্যাদি। লয় ভেদে উপরোক্ত তালগুলি দ্রুত, মধ্য ও বিলম্বিত এই তিন প্রকারে ব্যবহৃত হয়।

কীর্ত্তনে গায়কের ন্যায় বাদকের ও অনুভূতি প্রবল হওয়া আবশ্যক। ভাবের সহিত গান না হইলে যেমন রস সঞ্চারে বাধা হয়, তেমনি ভাবের

সহিত বাদ্য না হইলে ও রসপুষ্টিতে বাধা হয়। কীর্ত্তনে আখর যেমন স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইবে বাদ্য ও তেমনি স্তরে স্তরে বিস্তৃত হইয়া গীতের পারিপাট্য বিধান করিবে। বাজনার এই ভঙ্গীকে বলে কাটান ; আখরকে ও 'কাটান' বলা হয়, সুতরাং গায়ক ও বাদকের পূর্ণ সহযোগিতা না থাকিলে গান মাধুর্য্য মণ্ডিত হয় না।

আখর—সমস্ত ভারতীয় সঙ্গীত বিশেষ করিয়া কীর্ত্তনের রসসৃষ্টির মূল উৎস 'আধ্যাত্মিক-প্রয়োজন'। কীর্ত্তন গানে যেমন গায়কের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় পাওয়া যায়, এমন আর কোথায় ও দেখা যায় কিনা সন্দেহ। অনেক সময়ে কবিতার ভাব গম্ভীর, অর্থ হয়ত জটিল, এরূপ স্থানে গায়ক অক্ষর বা আখর জোগাইয়া তাহাকে সুবোধ্য করিবার চেষ্টা করেন। এই সুযোগে তিনি তাঁহার নিজের কবিত্ব-শক্তি, রসজ্ঞতা ও সুরজ্ঞতার পরিচয় দিতে পারেন। বড় ওস্তাদের গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি যেমন তাঁহার সুরসৃষ্টিতে—বড় কীর্ত্তনীয়ার গুণপণার প্রতিভার মাপকাঠি তেমনি তাঁহার আখর যোজনায়। মার্গসঙ্গীতে ওস্তাদ দেন সুরের তান, কীর্ত্তনে প্রেমিক দেন কথার তান—আখরের তান। এই খানেই তিনি সত্যিকারের স্রষ্টা। আখরের মাধ্যমেই শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তনকার-গীত পদাবলীর পদলালিত্য, ভাবমাধুর্য্য প্রেমিক শ্রোতার মর্ম্ম স্পর্শ করে। উদাহরণ স্বরূপ জ্ঞান দাসের পদাবলীর অংশ বিশেষের সহিত আখর যোজনা করিলেই বুঝা যইবে ঃ

"কী রূপ হেরিনু কালিন্দী কূলে
অতি অপরূপ কদম্ব মূলে !"

(ইহার উপর কীর্ত্তনাচার্য্য শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র ব্রজবাসী মহাশয় কৃত আখর)

ওগো — দুটি আঁখি—
আমায় — সবে দিলে দুটি আঁখি—
বিধি — দিলে দিলে দুটি আঁখি—
আমি — তাই বলি—সে কেমন বিধি ?
হায় — দিলে বিধি দুটি আঁখি—

কেন তাতেও আবার নিমিখ দিলে
সখী, যে হেরিবে কৃষ্ণানন—
তারে দেয়না কেন কোটি নয়ন

আখরের অব্যর্থ শরসন্ধানে প্রেমিক ও ভাবুক শ্রোতা কালিন্দী-কূলের কদম্বমূলে ভুবনমোহন কৃষ্ণরূপ দর্শনে ধীরে ধীরে আত্ম-বিস্মৃত হইয়া শ্যামসুন্দরের প্রেমসিন্ধুতে নিমজ্জিত হয়।

ষোড়শ শতাব্দীতে খেতরির মহোৎসব হইতেই কীর্ত্তনের প্রণালীবদ্ধ গীতের আরম্ভ ধরা যাইতে পারে। বৈষ্ণব সাহিত্য, সঙ্গীত ও ধর্ম্মের ইতিহাসে এই মহোৎসব এক অপূর্ব্ব ঘটনা। রাজা সন্তোষ দত্ত এই উৎসবে ছয়টি বিগ্রহের প্রতিষ্ঠা করেন এবং সেই উপলক্ষে তৎকালীন বৈষ্ণব জগতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ আমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। নিত্যানন্দ প্রভু-পত্নী জাহ্নবী দেবী, শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু, মহাকবি ও গায়ক গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস, সাধক প্রবর রঘুনন্দন, হৃদয় চৈতন্য প্রভৃতি এই উৎসবে সমাগত হইয়াছিলেন। খেতরি যে ভাব-বন্যা আনিয়া দিয়াছিল তাহার প্রেরণায় অগণিত ভক্তকবি, গায়ক, বাদক এক শতাব্দীর অধিককাল মুগ্ধ ছিলেন। শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্যের পরে এরূপ ভাবোদ্দীপনা আর হয় নাই। কীর্ত্তন-সঙ্গীতের পুণ্যতীর্থ এই খেতরিতেই অগণিত গুণীজনসমাবেশ দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল এবং বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত উক্ত কীর্ত্তন-সঙ্গীতের ধারাই চলিয়া আসিতেছে।

বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচার প্রভাবে ভারতবর্ষের নানাস্থানে রাধাকৃষ্ণলীলা বিস্তার লাভ করে এবং ঐ লীলা অবলম্বনে বহু পদাবলী রচিত হয়। মিথিলায় বিদ্যাপতির পদাবলী, যুক্তপ্রদেশে হিন্দিকবি সূরদাসের পদাবলী, রাজপুতনায় মূর্ত্তিমতী ভক্তিস্বরূপিনী মীরাবাই রচিত পদাবলী, শিখদের গ্রন্থসাহেবের পদাবলী, উত্তর পশ্চিম ভারতে বল্লভাচার্য্য ও তাঁহার ভক্তদের রচিত পদাবলীর রসমাধূর্য্য, বঙ্গদেশে প্রচলিত পদাবলী ও কীর্ত্তনের সহিত তুলনীয়। তুলসী দাস তাঁহার রামায়ণে যে দোহা, চৌপাই প্রভৃতি রচনা

করিয়াছেন ভারতের বহু স্থানে তাহা গীত হইয়া থাকে। ইহা ছাড়া তৎকালে উত্তর পশ্চিম ভারতে কয়েকজন মুসলমান কবি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা রাধাকৃষ্ণলীলা সম্বন্ধে পদ রচনা করিয়া যশস্বী হইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে রসখান্ ও খান্‌খানান আবদর রহিম খানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। দক্ষিণ ভারতের থালবারদের সঙ্গীত ও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। তামিল ভাষায় ইঁহাদের পদাবলী 'তামিলবেদ' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। সুতরাং পদাবলীর এই ভাবধারা শুধু বাঙ্গালার নয়—সমগ্র ভারতের সংস্কৃতির সম্পদ। ভারতবর্ষকে জানিতে হইলে এই ভাব ধারার সহিত বিশেষ পরিচয় থাকা বাঞ্ছনীয়।

পরমাত্মার প্রেম জীবাত্মার উদ্দেশে এবং জীবাত্মার প্রেম পরমাত্মার উদ্দেশে অনন্তকাল ধরিয়া ধাবিত হইতেছে। তাই বৈষ্ণব কবিগণ কল্পনা করিয়াছেন, ব্রহ্ম আপনার অন্তর্নিহিত প্রেমতৃষ্ণাকে সার্থক করিবার জন্য আপনার হ্লাদিনীশক্তিকে রাধারূপে প্রকটিত করিয়াছেন এবং নিজে শ্রীকৃষ্ণরূপে নরদেহ ধারণ করিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ মহাশয় ব্রহ্মের মুখে কথা বসাইয়া বলিয়াছেন—'রস আস্বাদিতে আমি কৈলুঁ অবতার'। ইহাই রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের মর্ম্ম কথা।

সচ্চিদানন্দ স্বরূপ ভগবান স্বয়ংই লীলারস উপভোগ করেন তাহা নহে, ভক্তগণকেও সেই রস আস্বাদন করাইবার জন্য তদীয় নিত্যসিদ্ধ হলাদিনী শক্তিকে আশ্রয় করিয়াছেন। এই হ্লাদিনী শক্তিই রাধা এবং এই রাধা সম্বন্ধে ভগবান বলিয়াছেন—

রাই তুমি যে আমার গতি।
তোমার স্মরণে—রস তত্ত্ব লাগি—
গোকুলে আমার স্থিতি ॥

তাই নিখিলভক্ত-হৃদয় ভক্তি ও প্রেমের প্রতীক শ্রীরাধার পদাঙ্কানুসরণে চির বাঞ্ছিতের চরণে—

'শ্যাম-বঁধু আমার পরাণ তুমি' বলিয়া আত্মনিবেদন করিয়া ধন্য হয়।

বাঙ্গালা দেশের লোক-সঙ্গীত

বাউল

ভাটিয়ালি, সারি, রামপ্রসাদী, কীর্ত্তন প্রভৃতির ন্যায় বাউল বাংলা দেশের অন্যতম লোক সঙ্গীত (Folk song)। আধ্যাত্মিক সাধনা হইতেই বাউলের উৎপত্তি। বাউল শব্দটির হিন্দী প্রতিশব্দ বাউরা অর্থাৎ পাগল। সাধারণতঃ "পাগল" বলিলে আমরা বিকৃত মস্তিষ্ক লোককেই বুঝি, কিন্তু "বাউল" বলিলে ভগবৎপ্রেমে আত্মভোলা সম্প্রদায়কেই বুঝিতে হইবে। প্রকৃতি, ভাব এবং আধ্যাত্মিক দৃষ্টিভঙ্গীর দিক দিয়া সুফী সম্প্রদায়ের ফকীর দরবেশদের সঙ্গে বাউলদের যথেষ্ট সাদৃশ্য আছে। আত্মার সহিত আত্মীয়তা তথা মমত্ববোধই বাউল-ধর্ম্মের অন্তর্নিহিত গূঢ় তত্ত্ব। তাই যুগে যুগে আত্মার সন্ধানেই বাউলরা নিরুদ্দেশ যাত্রা পথের পথিক।

"আমি কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ যে রে, হারায়ে সেই মানুষে তার উদ্দেশে দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে॥" বাউল গানের উপরোক্ত চরণ দুইটি বাউলের প্রিয়-বিরহ-কাতর মনের ব্যাকুলতা-ব্যঞ্জক। বাউলেরা বৈদান্তিকদের মত "ব্রহ্মসত্য জগৎ মিথ্যা" ধারণায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বাস্তব জগতের প্রতি বিমুখ নয়। অখণ্ড সৌন্দর্য্যের মূল-প্রাণশক্তিই যে জগতে রূপে, রসে, শব্দে, স্পর্শে, ও গন্ধে, সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত, বাউলেরা এই পরমতত্ত্বের খবর রাখে তাই বহির্জগতের অনুপম বিকাশের মধ্য দিয়াই তাহারা হৃদয়-দেবতার সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু অসীমকে সীমার মধ্যে আনিয়া তাহাকে উপলব্ধি করার এই প্রচেষ্টা সহজ নয়। সীমার সহিত অসীমের, খণ্ডের সহিত অখণ্ডের, ব্যক্তের সহিত অব্যক্তের, পার্থিবের সহিত অপার্থিবের মিলন-সাধনার দুস্তর অভিসারের পথে আশা, নিরাশা, অশ্রু, মনস্তাপ, দীর্ঘশ্বাস ক্ষণে ক্ষণে বাউল মনে সব পাইয়া

ও সব হারাইবার হাহাকার আনিয়া দেয় এবং তাহারই প্রতিধ্বনি আমরা শুনিতে পাই বিভিন্ন বাউল গানে।

ভাটিয়ালী

এই সুর কবে সৃষ্ট হইয়াছিল জানা নাই, তবে পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালা, মিথিলা ও আসামে ইহা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হয়। ভাটিয়ালী শব্দটীর ব্যুৎপত্তিগত অর্থ ধরিলে মনে হয় যে নৌকার মাঝিদের গান হইতেই এই সুরের উৎপত্তি। সুজলা, সুফলা, শষ্য-শ্যামলা বাঙ্গালার দরদী মাঝি ভাটার টানে নৌকা ছাড়িয়া মনের আনন্দে মুক্তকণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া যে গান গাহিত সেই গানই ভাটিয়ালী নামে প্রচলিত। অবশ্য দাঁড় টানার তালে তালে মাঝিরা যে গান গাহিত তাহা সারি গান বলিয়া পরিচিত। সারি গান একটা বিশিষ্ট ছন্দে গীত হয় কিন্তু ভাটিয়ালী মুক্ত-ছন্দ। প্রতিটি স্তবকের শেষে সুরের একই প্রকারের সালঙ্কারিক বিলম্বিত ব্যঞ্জনা ভাটিয়ালীর নিজস্ব বৈশিষ্ট্য। এই বিলম্বিত তান নদী প্রবাহের অবাধ গতিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ভাটিয়ালী গান বা ভাটিয়ালী সুরের উদ্ভব যেখান হইতেই হউক না কেন আবহমান কাল হইতে বাঙ্গালার মাঝির সুরে সুর মিলাইয়া বাঙ্গালার চাষী ও রাখালরাও ঐ গান গাহিয়া আসিতেছে এবং বর্ত্তমান কালে শিক্ষিত ও আধুনিক রুচিসম্পন্ন লোকের সঙ্গীতের আসরে ও অন্যান্য গানের পংক্তিতে ইহা একটী বিশিষ্ট স্থান লাভ করিয়াছে।

সারিগান

নদী মাতৃক পূর্ব বাংলার জনপ্রিয় লোকসঙ্গীতের বিশেষ একটি রূপ সারি গান। বর্ষাকালে নদীজলে বহু স্থানে বাইচ্ খেলার উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রতিযোগিতামূলক নৌকা দৌড়কেই বাইচ্ খেলা বলা হয়। সুদীর্ঘ এক একটি ছিপের দুই পাশে ছোট ছোট বৈঠা হাতে সারি বাঁধিয়া বসিয়া সকলে বৈঠা চালায় তখন তাদের কণ্ঠে থাকে সারি

গান। গানের ছন্দে ছন্দে ছিপের কানিতে পড়ে বৈঠার হাতলের আঘাত। গানের লয় হইতে থাকে দ্রুত হইতে দ্রুততর এবং ছিপখানিও তখন বিদ্যুৎ বেগে চলিতে থাকে। বস্তুতঃ সারিগানের সঙ্গে দ্রুত এই বৈঠা চালনা একটি মনোমুগ্ধকর দৃশ্যের অবতারণা করে। সাধারণতঃ সারিগানের লয় দ্রুত হইয়া থাকে এবং তার সুরটিও থাকে দ্রুত ছন্দের। সারি বাঁধিয়া এই গান গাওয়া হইয়া থাকে বলিয়াই ইহার নাম সারিগান। অনেক সারি গানে শ্লীলতাবর্জিত ভাষা দেখিতে পাওয়া যায়।

জারিগান

কারবালা প্রান্তরে ইমাম হাসান ও হোসেনের শোকাবহ জীবনাবসানের ঘটনাকে অবলম্বন করিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের অতি প্রিয় জারি গান রচিত হইয়া থাকে। এ গান পূর্ববঙ্গে বহুল পরিমাণে গীত হয় এবং হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই থাকে এ গানের শ্রোতা। যাহারা এ গানে অংশ গ্রহণ করে তাহারা মালকোচা করিয়া কাপড় পরে, প্রত্যেকের হাতে থাকে একখানা করিয়া রুমাল, পায়ে থাকে নূপুর এবং বলিষ্ঠ নৃত্যসহযোগে এ গান সমবেত কণ্ঠে গাওয়া হইয়া থাকে। জারি গানের করুণ সুর সহজেই অন্তরকে স্পর্শ করে। এ গানের সঙ্গে ঢোল সঙ্গত হইয়া থাকে।

ভাওয়াইয়া গান

ভাওয়াইয়া উত্তর বঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহারের বহুপ্রচলিত লোকগীতি। দোতারা সহযোগে এ গান গাওয়া হয়। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের লোকই এ গানের গায়ক। ভাওয়াইয়া গানের করুণ মধুর সুরে অনেকটা পূর্ববঙ্গের ভাটিয়ালি সুরের ছাপ থাকিলেও তার ছন্দ এবং গায়ন ভঙ্গিতে যথেষ্ট পার্থক্য রহিয়াছে। বহু ভাওয়াইয়া গানে লৌকিক বিরহ বিচ্ছেদের কথাই পাওয়া যায় এবং সেই সুরের আবেদন অন্তরকে সহজেই দ্রবীভূত করে। এ

সুরের মধুর ব্যঞ্জনা অন্তর্নিহিত ভাবকে যথাযোগ্য রূপ দিতে সক্ষম বলিয়াই হয়ত এ গানকে ভাওয়াইয়া গান বলা হইয়াছে। এতদ্‌ভিন্ন সেখানে বাউলদের ন্যায় "বাউদিয়া" নামক এক সম্প্রদায় ঘুরিয়া ঘুরিয়া এ গান গাহিয়া বেড়ায়। এই বাউদিয়া নাম হইতেই "ভাওয়াইয়া" নামের উৎপত্তি হওয়া ও সম্ভব।

চট্‌কা গান

চট্‌কা গানকে উত্তর বঙ্গের ভাওয়াইয়া গানেরই একটি উপশাখা বলা যায়। ভাওয়াইয়ার করুণ রস এ গানে নাই, এর গীত রীতিতে আছে চটুলতা এবং এর রসও হালকা, গায়ন পদ্ধতিও পৃথক। সাধারণতঃ রঙ্গরসের কথায় হয় এর রচনা। সাংসারিক জীবনের খুঁটিনাটি বিষয় বস্তুই এর উপজীব্য। চট্‌কা গানের ছন্দ চটুল, লয় দ্রুত এবং সুর সহজ। হাল্‌কা রসের চটকদার গান বলিয়াই এর নাম চট্‌কা হইয়া থাকিবে। ভাটিয়ালি গানের পাশে সারি গানের মতই ভাওয়াইয়ার পাশে চট্‌কার তুলনা করা যাইতে পারে।

গম্ভীরা

মালদহের প্রসিদ্ধ গান গম্ভীরা। বাংলা দেশে শিবের গান খুব প্রাচীন। শিবকে কেন্দ্র করিয়াই নীলের গান, গাজন গান ও গম্ভীরা গানের সৃষ্টি হইয়াছে। পরন্তু এই তিন প্রকারের শিব সঙ্গীতের গায়কী পৃথক্ পৃথক্। মালদহের গম্ভীরা গানের রচনা ও সুরের একটি নিজস্ব স্বতন্ত্র রূপ পরিলক্ষিত হয়। সং, শোভাযাত্রা ও নাচের মাধ্যমে মালদহে গম্ভীরা উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে এবং গম্ভীরা গানের আসরও হইয়া থাকে। আসরে গানের মাধ্যমে প্রশ্ন ও উত্তর চলে এবং দলপতিরা উপস্থিত মত গান রচনা করিয়া দেন।

গম্ভীরা গানের শিব অনেকটা গাজনের শিবেরই ন্যায় আত্মভোলা এবং এ শিব জনসাধারণের অতি আপন জন। শিবকে নিয়া ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ

উপহাসও চলে আবার শিবের নিকট আবদার, অভিযোগ এবং প্রার্থনাও জানানো হয়।

গম্ভীরা গানের নিজস্ব একটি বৈশিষ্ট্য আছে এবং কয়েকটি সুরের মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি। গম্ভীরা সাধারণতঃ দ্রুত লয়ে গাওয়া হইয়া থাকে। সামাজিক বিশেষ বিশেষ ঘটনাকে অবলম্বন করিয়াও গম্ভীরা গান রচিত হইয়া থাকে।

ঝুমুর

ঝুমুর একপ্রকার নৃত্য-বহুল, আদিরসাত্মক লোক সংগীত। বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায় ইহা যাত্রা এবং পাঁচালীর মাঝামাঝি স্থান পাইবার যোগ্য। চতুর্দ্দশ শতাব্দী হইতে উহা বর্ত্তমান বাঙ্গালার বীরভূম, বাঁকুড়া, মেদিনীপুর এবং ছোটনাগপুরের মানভূম, ধলভূম, সিংভূম ও অন্যান্য অঞ্চলে সাঁওতাল, কোল্, মুণ্ডা প্রভৃতি অনুন্নত সম্প্রদায়ের মধ্যে বিশেষ ভাবে প্রচলিত আছে। উহাদের প্রতিটি উৎসব ঝুমুর গানে মুখরিত হইয়া উঠে। রাধাকৃষ্ণের প্রণয় গীতিই ঝুমুরের প্রধান বিষয় কিন্তু উহা সাধারণতঃ রুচি-বিগর্হিত ভাষা ও ভঙ্গীতে গাওয়া হইয়া থাকে। ঝুমুরে পুরুষেরা নৃত্যের সহিত মাদল ও বাঁশী বাজায় আর স্ত্রীলোকেরা দলবদ্ধ-ভাবে নৃত্যের সহিত গান গাহিয়া থাকে। জ্যোৎস্না রাত্রিতে একটা সহজ ও সরল পরিবেশের মধ্যে বনফুলে সজ্জিত শাল-মহুয়ার দেশের দামাল ছেলেমেয়েদের প্রাণ-মাতান, মনভোলান সাবলীল নৃত্য-গীতি এক অভূতপূর্ব্ব আনন্দ ও উদ্দীপনার সৃষ্টি করে।

ঝুমুর গানের সুরে বিশেষ কোনও বৈচিত্র্য নাই। উহা সাধারণতঃ কতিপয় স্বরের সাহায্যে রচিত এবং অনেকটা কার্ফা তালের মত তালে একটানা ছন্দে গীত হয়। ঝুমুর নৃত্যে একটা সাবলীল ছন্দ রহিয়াছে সত্য এবং উহা অনেকটা ভরা ভাদ্রের উদ্ভিন্নযৌবনা দুকুলপ্লাবী তটিনীর ন্যায় কিন্তু উহাতেও ছন্দ বৈচিত্র্যের অভাব সুস্পষ্ট।

ভাদু গান

বাঁকুড়া, বীরভূম ও বর্দ্ধমান অঞ্চলের বিশিষ্ট লোক সঙ্গীত এই "ভাদু গান"। ভাদ্রমাসে কুমারীরা গ্রামে গ্রামে লক্ষ্মীর ন্যায় 'ভাদু' প্রতিমা তৈরী করিয়া পূজা করে ও গান করিয়া থাকে। পাড়ায় পাড়ায় তর্জা গানের ন্যায় পূজারিণীদের মধ্যে গানে পাল্টা পাল্টি হয়। এই লোক সঙ্গীতের যথেষ্ট প্রভাব ও সমাদর আছে।

'রবীন্দ্র সঙ্গীত'

বাল্যকাল হইতেই রবীন্দ্রনাথের মধ্যে কবিত্ব ও সঙ্গীত প্রতিভার স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর গান সম্বন্ধে তিনি নিজেই বলিয়াছেন "কবে যে গান গাহিতে পারিতাম না তাহা মনে পড়ে না"। বাল্য ও কৈশোরের কবিতা ও গীত রচনার পরে তাঁহার যৌবন বয়সের রচিত—

"নয়ন তোমারে পায়না দেখিতে রয়েছ নয়নে নয়নে,
হৃদয় তোমারে পায়না জানিতে হৃদয়ে রয়েছ গোপনে"

গানখানি ঘটনাক্রমে তাঁহার পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৃষ্টিতে পড়ে এবং মহর্ষি পুত্রের এতাদৃশ প্রতিভা দর্শনে অতিশয় আনন্দিত হইয়া সস্নেহে রবীন্দ্রনাথকে আপনার নিকট ডাকিয়া পুরস্কৃত করিয়া উৎসাহ দান করেন। এই ভাবে শৈশবে, যৌবনে ও পরিণত বয়সে ঐ শিশুকবির বিস্ময়কর বিরাট প্রতিভা তাঁর অপূর্ব্ব সৃজনী শক্তির পরিচয় দিয়াছিল সাহিত্যে, গল্পে, প্রবন্ধে, নাটকে, উপন্যাসে এবং সঙ্গীতে। সমুদ্র যেমন অপার বিস্ময়ের বস্তু, রবীন্দ্রনাথের বহুমুখী প্রতিভাও তেমনি বিস্ময় হইতেও বিস্ময়কর। এই বিরাট প্রতিভার পরিমাপ করিতে যাওয়া যেন মহাকবি কালিদাসের ভাষায় "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ুপেনাস্মি সাগরম্" তল্লিখিত রঘুবংশের এই শ্লোকটীকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা হউক রবীন্দ্রনাথের সারা জীবনের যাহা কিছু দান তাহার আলোচনা আমরা করিবনা ; ইহা তাঁহার ক্ষেত্র নহে, শুধু রবীন্দ্রনাথের গানই বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়।

রবীন্দ্রনাথ তাঁহার জীবনে প্রায় আড়াই হাজার গান রচনা করিয়াছেন। ভাবের অভিনবত্বে, ভাষার লালিত্যে, ছন্দ ও সুরের বৈচিত্র্যে তাঁহার গান বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা গানের ক্ষেত্রে এক অতুলনীয় দান।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গীত রচনায় মার্গসঙ্গীতের প্রভাব বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয় এবং তাহার কারণও আছে। অনুসন্ধান করিলে দেখা যায় যে অতি অল্প বয়স হইতে কবির অন্তরে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের প্রভাব পড়ে। জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়ীতে প্রায় সর্ব্বদাই উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসর বসিত এবং বাংলার ও বাংলা বর্হিভূ‌র্ত স্থানের বিখ্যাত গায়কগণ এ বাড়ীতে গান করিতেন। বলা বাহুল্য যে, সেই সকল গানের আসরে নীরব শ্রোতা হিসাবে রবীন্দ্রনাথ সর্ব্বদাই উপস্থিত থাকিয়া অতিশয় মনোনিবেশ সহকারে সেই সকল গান শুনিতেন। সেই সময়ই হিন্দী গানের অনুকরণে তিনি বাংলা গান রচনা করিতে থাকেন। জানা যায় যে রবীন্দ্রনাথ, বাড়ীতে ওস্তাদের নিকট মার্গ সঙ্গীত শিক্ষা করিয়াছিলেন এবং রবীন্দ্রনাথের উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের গুরু হিসাবে বাংলার গৌরব, সঙ্গীত গুরু যদুভট্টের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষাকালে যখন ধ্রুপদ ও ধামার নিয়া তিনি নিবিষ্ট ছিলেন, তদ্‌রচিত বাংলা ধ্রুপদ, ধামার গান সেই সময়েরই রচনা বলিয়া ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। তৎকালে তিনি যে গান রচনা করিয়াছিলেন তার অধিকাংশগুলিই হিন্দী গানের অনুকরণে লিখিত রাগসঙ্গীত। শ্রীযুক্তা ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী প্রণীত "রবীন্দ্র সঙ্গীতে ত্রিবেণী সঙ্গম" পুস্তিকাখানিতে মূল হিন্দী গান-গুলি উল্লিখিত আছে। প্রতিটি গানই সুসংযত এবং তাহাতে তান বা বাটের কোন প্রকার বাহুল্য একেবারে নাই। কথা ও সুরের মিলনে

প্রতি গানের একটি অনবদ্য রূপ সৃষ্টি হইয়াছে। তাতে অতিরিক্ত অলঙ্কার আরোপ করার কোনই প্রয়োজন নাই। কেহ কেহ রবীন্দ্র সঙ্গীতে তান ও বাটের ব্যবহার প্রচলন করার পক্ষপাতী কিন্তু বিশেষ ভাবে প্রণিধান করিলে দেখা যাইবে যে রবীন্দ্রনাথ স্বয়ংই তাঁহার বহু গানে সূক্ষ্ম তানের প্রয়োগ করিয়াছেন বিচিত্র কৌশলে। সুতরাং রবীন্দ্র সঙ্গীতে নূতন আর কিছু করিতে না যাওয়াই ভাল। ইহা দ্বারা রবীন্দ্র সঙ্গীতের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যকেই ক্ষুণ্ণ করা হয় মাত্র।

তাঁহার গান তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের বাংলা গান হইতে সম্পূর্ণ আলাদা ধরণের—যাহার ভাব, ভাষা ও সুরের ভঙ্গী পৃথক—বক্তব্য পৃথক এবং যে গান বাংলা গানের রাজ্যে এক যুগান্তর আনিয়া দেয় এবং অতি স্পষ্ট কারণেই সেই গানের নাম হইয়া পড়ে "রবীন্দ্রসঙ্গীত"।

তাঁহার গানে দেখিতে পাই কথা ও সুরের এক অপূর্ব্ব মিলন তীর্থ। গানের ভাষার সহিত সুরের এই আত্যন্তিক সংগতি রবীন্দ্রনাথের এক বিরাট দান—বাংলা গানে কথার সহিত সুরের এই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ঘটাইয়া রবীন্দ্রনাথ এক নূতন পথের সন্ধান দিলেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবি ও সুরকারই এ বিষয়ে এতটা সচেতন ছিলেন না।

মানুষের অন্তরের অতি সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি রবীন্দ্রনাথ অতি নিপুণ ভাবে তাঁহার কথা ও সুরে রূপায়িত করিয়া তুলিয়া ধরিয়াছেন বিশ্বের সম্মুখে। সেই গানে জগৎ মুগ্ধ হইয়াছে—রবীন্দ্র সঙ্গীত বিশ্বের বিদগ্ধ সমাজের অন্তর জয় করিয়াছে তার রূপে, রসে ও বৈচিত্র্যে—তাইত রবীন্দ্রনাথ হইয়াছেন বিশ্বকবি।

সুখ, দুঃখ, আনন্দ, আশা, নৈরাশ্য, শোক, সান্ত্বনা, মিলন, বিচ্ছেদ, প্রার্থনা, প্রেম, বিরহ, বেদনা প্রভৃতি যাবতীয় ভাবই তাঁহার গানে রহিয়াছে। "প্রকৃতি" পর্য্যায়ে আছে বিভিন্ন ঋতুকে নিয়া লেখা বিভিন্ন প্রকারের ঋতু-সঙ্গীত—গ্রীষ্ম, বর্ষা হইতে সুরু করিয়া বসন্ত পর্য্যন্ত কোন ঋতুকেই তিনি বাদ দেন নাই। "পূজা" ও "প্রেম" পর্য্যায়ে আছে তাঁহার পূজা ও প্রেম-

ধর্ম্মী বহুবিধ অপূর্ব্ব রচনা। গীতি রচনার ক্ষেত্রে জন্ম, মৃত্যু, বিবাহ, শ্রাদ্ধ প্রভৃতিও তাঁহার দৃষ্টি এড়ায় নাই। তাই আমরা তাঁহার নিকট হইতে পাই আনুষ্ঠানিক গান হিসাবে—জন্মদিনের গান, বিবাহ বাসরের গান, শ্রাদ্ধ বাসরের গান প্রভৃতি। পূর্বোক্ত উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত ও নানা পর্য্যায়ের গানের পরেই আছে তাঁহার লোকসঙ্গীত-ধর্ম্মী বাউল গান, ভাটীয়ালি সুরের, রামপ্রসাদী সুরের এবং পাশ্চাত্য সুরের গান, বহুবিধ কীর্ত্তনাঙ্গের গান এবং বিভিন্ন প্রদেশের নানা প্রকার বিচিত্র সুরের গান। বিদ্যাপতির মৈথিলী ভাষার অনুকরণে লিখিত "ভানুসিংহের পদাবলী" তাঁহার এক অনবদ্য সৃষ্টি। সমস্ত পর্য্যায়ের গানের নাম উল্লেখ করিতে গেলে বিরাট তালিকা হইয়া পড়িবে সুতরাং এ বিষয়ে এখানেই ক্ষান্ত রহিলাম।

রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা বিষয়ে দু' চারটি কথা বলার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। রবীন্দ্র সঙ্গীতের বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া গাহিতে হইলে প্রাথমিক স্বর সাধনা ও অল্পবিস্তর উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা করা অবশ্যই কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করি। কাহারও কাহারও ধারণা এই যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীত শিক্ষা রবীন্দ্র সংগীত শিক্ষার পরিপন্থী, কিন্তু কথাটী মোটেই ঠিক নহে এবং অনবধানতার পরিচায়ক। রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির দিকে দৃষ্টিপাত করিলে ইহা বুঝিতে বাকী থাকে না যে উত্তম স্বরজ্ঞান ব্যতিরেকে গানের সুরটীকে ঠিক ঠিক মত ফুটাইয়া তোলা অনেক গানের ক্ষেত্রে সহজ নহে।

প্রসঙ্গতঃ ১৯৩৮ সনে আমার অগ্রজ স্বর্গীয় ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শান্তিনিকেতনে মার্গ সঙ্গীতের প্রধান অধ্যাপক থাকাকালীন উত্তরায়ণে বসিয়া গুরুদেবের সহিত আমাদের উভয় ভ্রাতার একদিন যে আলোচনা হইয়াছিল তাহা এখানে উল্লেখ করিবার লোভ সম্বরণ করিতে প্যারিলাম না। গুরুদেব সেইদিন তদীয় গান সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে এই কথা কয়টী আগ্রহের সহিতই আমাদিগকে বলিয়াছিলেন। তিনি বলেন "আমার গান তোমরা যদি না গাও তবে আমার গান স্থায়ী হবে না—বেসুর ও বেতালে গাওয়া হ'লে আমার গানের উপর কারো শ্রদ্ধা

থাকবে না।" সুতরাং রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে স্বরজ্ঞান ও তালজ্ঞান থাকার প্রয়োজন বিষয়ে কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে আমি যাহা বলিয়াছি গুরুদেবের কথার মধ্যে সেই ইঙ্গিতই রহিয়াছে। রবীন্দ্র সঙ্গীত শিক্ষার্থীর পক্ষে রবীন্দ্র কাব্যের সহিত ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকাও একান্ত ভাবে আবশ্যক তাহা উল্লেখ না করিলে এই প্রসঙ্গ অসম্পূর্ণ থাকিবে। রবীন্দ্র-সঙ্গীতের বিভিন্ন স্তর সম্বন্ধে 'সঙ্গীত-দর্শিকা'র দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচনা করার ইচ্ছা রহিল।

শ্যামাসঙ্গীত

ষোড়শ শতাব্দী হইতে জগজ্জননী শ্যামা মাকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালা দেশে যে এক বিশিষ্ট সঙ্গীত ধারা চলিয়া আসিয়াছে উহাই শ্যামাসঙ্গীত বলিয়া প্রচলিত। বাঙ্গালী সাধক সগুণ ব্রহ্মের উপাসনা ক্ষেত্রে কালী ও কৃষ্ণে অভেদ রূপ কল্পনা করিয়াছেন। "কলৌ কালী কলৌ কৃষ্ণঃ কলৌ গোপালকালিকা" তন্ত্রের এই নির্দ্দেশ বাঙ্গালার হিন্দুর ন্যায় ভারতবর্ষের আর কোন প্রদেশের হিন্দুই তেমন ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। কৃষ্ণপূজার প্রচার ও প্রভাব বাঙ্গালার বাইরে অন্যান্য প্রদেশে ও পরিলক্ষিত হয় কিন্তু শ্রীভগবানকে দুর্গা, শ্যামা, জগদ্ধাত্রী প্রভৃতি মাতৃরূপ দিয়া মাতৃভাবে বাঙ্গালার ন্যায় 'মা' বলিয়া ডাকিতে, আরাধনা করিতে পৃথিবীর কোনও জাতি পারে নাই। মাকে মেয়ে রূপে কল্পনা করিয়া এদেশের ভক্ত ও সাধকেরা যে নূতন ভাবধারার সন্ধান দিয়াছেন তাহার নিদর্শন অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। কীর্ত্তন যেমন বৈষ্ণব পদাবলী অবলম্বনে গাওয়া হইয়া থাকে, শ্যামাসঙ্গীত ও তেমনি শাক্ত পদাবলী অবলম্বনে গীত হয়।

প্রায় ৪ হাজার শক্তি-বিষয়ক সঙ্গীত এবং দেড় শতাধিক রচয়িতার নাম পাওয়া যায়। সর্ব্বপ্রথম শাক্ত সঙ্গীত কে রচনা করেন তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা কঠিন কিন্তু রামপ্রসাদ সেনই যে উহাদের সর্ব্বাগ্রগণ্য সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। কালিদাস চট্টোপাধ্যায় (কালী মির্জা) কমলাকান্ত

ভট্টাচার্য্য, রাম বসু, হরু ঠাকুর, গোবিন্দ চৌধুরী, গিরিশচন্দ্র ঘোষ, মহতাব চাঁদ (মহারাজ), দাসরথি রায়, এণ্টনি সাহেব, রামকৃষ্ণ রায় (মহারাজ) প্রভৃতির নাম ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

শ্যামা সঙ্গীত, চৌতাল, তেওরা, যৎ, সুলতাল, আড়াচৌতাল, একতাল, ঝাঁপতাল, ত্রিতাল প্রভৃতি বিভিন্ন তালে এবং বিভিন্ন শুদ্ধ ও মিশ্র রাগে একটি স্বতন্ত্র প্রণালীতে গাওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্ত প্রবর রামপ্রসাদের শ্যামা বিষয়ক সঙ্গীত এক অভূতপূর্ব্ব ভাব, ভাষা ও সুর সমন্বয়ে রচিত। 'প্রসাদী সুর' তাঁহার অপূর্ব্ব সৃষ্টি। রামপ্রসাদের গানের ন্যায় কোন প্রকার সাধন-সঙ্গীতই বোধ হয় এত শীঘ্র এবং এমন গভীর ভাবে ভক্ত হৃদয় স্পর্শ করে নাই। রামপ্রসাদ বাঙ্গালার একজন শ্রেষ্ঠ সাধক কবি। তিনি "কালী হলি মা রাসবিহারী—নটবর বেশে বৃন্দাবনে", "ঐ যে কালী কৃষ্ণ, শিব, রাম—সকল আমার এলোকেশী" প্রভৃতি সুমধুর গান রচনা করিয়া অভেদ জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন।

পরব্রহ্মের জগন্মাতৃত্ব ও জগৎ পিতৃত্বের প্রকাশই যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব এবং কালী, দূর্গা ও তারা নামে সূচিত। "সাধকানাং হিতার্থায় ব্রহ্মণো রূপকল্পনা" সাধকদের মঙ্গলের জন্যই ব্রহ্মের বিভিন্ন রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। ভগবান্ বাক্য ও মনের অগোচর 'অবাঙ মনসগোচরম্' তিনি রসস্বরূপ—'রসো বৈ সঃ'—তিনি ভাবের ঠাকুর। সাধকপ্রবর রাম-প্রসাদ বলিয়াছেন—"সে যে ভাবের বিষয়, ভাব ব্যতীত অভাবে কি ধরতে পারে।" এই ভাবের সাহায্যেই ভগবানের সহিত মমত্ব সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও বলিতেন—'ভাব কি জান' তাঁর (ঈশ্বরের) সঙ্গে একটী সম্বন্ধ রাখা—এর নাম।" হিন্দুর দেব দেবীর এই উপাসনা-তত্ত্ব না বুঝিলে বৈষ্ণব পদাবলী কিংবা শাক্ত পদাবলীর রস উপলব্ধি করা সম্ভব নয়।

বৈষ্ণব পদাবলীর ন্যায় ভাব হিসাবে শ্রেণী বিভাগ করিলে শাক্তপদাবলীকে বহুভাবে বিভক্ত করা যায় যথা ঃ—

১। বাল্য-লীলা	৭। মনোদীক্ষা	১৩। মাতৃ পূজা
২। আগমনী	৮। ইচ্ছাময়ী মা	১৪। সাধন শক্তি
৩। বিজয়া	৯। করুণাময়ী মা	১৫। নাম-মহিমা
৪। জগজ্জননীর রূপ	১০। কালভয়হারিণী মা	১৬। চরণ-তীর্থ
৫। মা কি ও কেমন	১১। লীলাময়ী মা	ইত্যাদি।
৬। ভক্তের আকৃতি	১২। ব্রহ্মময়ী মা	

সাধক-শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ ব্রহ্মময়ী, শক্তি-স্বরূপিণী শ্যামা মায়ের বিভিন্ন ঐশ্বর্য্যের প্রকাশকে প্রদক্ষিণ করিয়া জগতের সর্ব্বতীর্থসার মাতৃ পাদপদ্মে—

"কাজ কি রে মন যেয়ে কাশী।
কালীর চরণে কৈবল্যরাশি॥
সার্দ্ধ ত্রিশ কোটি তীর্থ মায়ের ও চরণ-বাসী।
যদি সন্ধ্যা জান, শাস্ত্র মান, কাজ কি হ'য়ে কাশীবাসী?
হৃৎ-কমলে ভাব ব'সে চতুর্ভূজা মুক্তকেশী।
রামপ্রসাদ এই ঘরে বসে' পাবে কাশী দিবানিশি॥"

এই বলিয়া আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। নিখিল ভক্ত-হৃদয় ও রামপ্রসাদের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া তাঁহারই ভাষায় তাঁহারই সুরে—

"আর কাজ কি আমার কাশী?
মায়ের পদ-তলে প'ড়ে আছে গয়া গঙ্গা বারাণসী।
হৃৎ-কমলে ধ্যান-কালে আনন্দ সাগরে ভাসি।
ওরে কালীর পদ-কোকনদ, তীর্থ রাশি রাশি॥"

এই বলিয়া গান করিতে করিতে—সর্ব্বতীর্থ-সার করুণাময়ী মায়ের সেই চরণতলে আশ্রয় লাভ করিয়া শান্তি লাভ করুক।

---

০)

লাস

ণ

প

বৈষ

বলীকে

১।

২।

৩।

৪।

৫।

৬।

স

বিভিন্ন

পাদপ

প্রস

সে

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	...	৫	(৫০০ খ্রীঃ)	(খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০-৫০০)
৫	...	১৭	লঙ্কধন	লঙ্কদহন
৬	...	৯	বিটল	বিট্‌ঠল
৮	...	১	অনুপবিলাস	অনূপসঙ্গীতবিলাস
৮	...	২	অনুপাঙ্কুশ	অনূপসঙ্গীতাঙ্কুশ
৯	...	১৭	ইহার পর	ইহার পূর্ব্বে
৯	...	২২	"সঙ্গীত কল্পদ্রুম"	রাগ কল্পদ্রুম
৪৫	...	৪	ঝাঁঘি	ঝাঁখি
৪৫	...	৪	জাখি	জাঘি
৪৭	...	৩	২ তাখি গুরুগুরু	২ তা খি-গুরুগুরু
৪৭	...	৬	+ দাখি	+ দাঘি
৮০	...	৫	পম, গ	পম, গ
৮৫	...	১০	প	প
৮৬	...	৬ এবং ৮	গ	গ
১০১	...	৫	গ সা প সা গ প	প সা প সা গ প
১১৯	...	১৭	প্রভৃতি	প্রকৃতি
১২১	...	৯	উদ্দ্	উর্দ্দ্
১২৩	...	২৪	ঘরোনা	ঘরোয়ানা
১২৩	...	৪	আমাপর	আপামর

বৈষ
বলীকে
১।
২।
৩।
৪।
৫।
৬।
স
বিভিন্ন
পাদপ
প্রস
সে

শুদ্ধি পত্র

পৃষ্ঠা		পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২	…	৫	(৫০০ খ্রীঃ)	(খৃষ্টপূর্ব্ব ১০০-৫০০)
৫	…	১৭	লঙ্কধন	লঙ্কদহন
৬	…	৯	বিটল	বিট্‌ঠল
৮	…	১	অনুপবিলাস	অনূপসঙ্গীতবিলাস
৮	…	২	অনুপাঙ্কুশ	অনূপসঙ্গীতাঙ্কুশ
৯	…	১৭	ইহার পর	ইহার পূর্ব্বে
৯	…	২২	"সঙ্গীত কল্পদ্রুম"	রাগ কল্পদ্রুম
৪৫	…	৪	ঝাঁঘি	ঝাঁখি
৪৫	…	৪	জাখি	জাঘি
৪৭	…	৩	২ তাখি গুরুগুরু	২ তা খি-গুরুগুরু
৪৭	…	৬	+ দাখি	+ দাঘি
৮০	…	৫	পম, গ	পম, <u>গ</u>
৮৫	…	১০	প়	প
৮৬	…	৬ এবং ৮	<u>গ</u>	গ
১০১	…	৫	গ সা প সা গ প	প সা প সা গ প
১১৯	…	১৭	প্রভৃতি	প্রকৃতি
১২১	…	৯	উদ্দু	উর্দ্দু
১২৩	…	২৪	ঘরোনা	ঘরোয়ানা
১২৩	…	৪	আমাপর	আপামর

